মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা- ০২

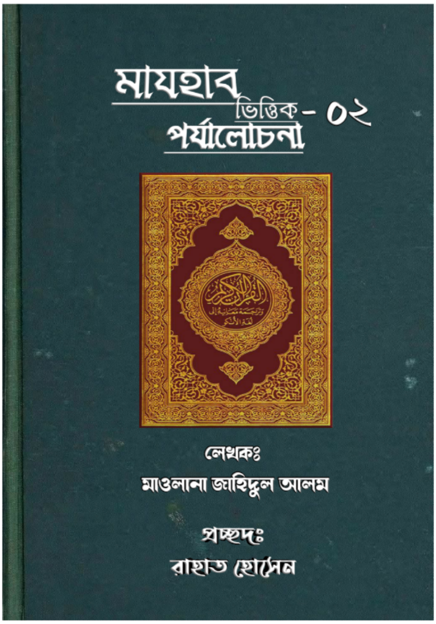

সাধারন পাঠকদের কথা চিন্তা করে
(মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা পর্ব-০২)
পিডিএফ ফাইলটি তৈরি করা হয়েছে,

যেন তারা ভবিষ্যৎএ এই ফাইলটি
দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

এটি কোন বই না।

আমাদের দেশের বেশকিছু
লা-মাযহাবী শায়েখরা তাদের প্রশ্নের
মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে
থাকেন।

তাদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এবং
হানাফী মাযহাব সম্পর্কে তাদের ভুল
ধারনাগুলো খন্ডন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কওমী পড়ুয়া একজন
দ্বীনি ভাই মাওলানা জাহিদুল
আলমের বেশ কিছু লিখার উত্তর
ভিত্তি করে এই পিডিএফটি বানানো
হয়েছে।

রাহাত হোসেন

সূচিপত্রঃ

১) কেমন ছিলো নবীর যুগের মাদ্রাসা

২) ইমাম আবু হানিফা রহ.এর চমৎকার একটি ঘটনা।

৩) উলুমুল হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আছে এমন যে কেউ জানেন "খবর বা হাদীস মুলত দুই প্রকার।মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ।

৪) প্রশ্ন: হুজুর যা বলে সব তো ইমামদের কথাই বলে,আপনারা এতো ফিতনা ফিতনা করেন ক্যান?

৫) "কেউ যখন অন্যজনের শাস্ত্রে অনধিকার চর্চা করে তখন সে নানা আজব ঘটনার জন্ম দেয়"।-ইমাম ইবনে হাজার রহ.

৬) "যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে বিতর্কের ক্ষেত্র বানায় তার ঘন ঘন তানাক্কুল তথা মাযহাবের স্থানান্তর ঘটে।"- খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.(সুনানে দারেমী)

৭) জাল হাদীস মোকাবেলায় মুহাদ্দিসীনে কেরামের অবদান

৮) জাল হাদীস: পরিচয় ও কিছু সাধারণ লক্ষণ।

৯) সহীহ হাদীস: ভ্রান্তি ও প্রান্তিকতা।

১০) হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কেন?

১১) যেমন ছিলেন ইমামে আযম আবু হানিফা রহ.।

১২) ইমাম আবু হানিফা রহ. কি হাদীস কম জানতেন?

১৩) মুজতাহিদ হওয়ার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।

১৪) ফিকহুল হানাফী নাকি ফিকহুস সুন্নাহ,কোনটা অনুসরণ করব?

১৫) চারমাযহাবকে এক করে দিলে কি সমস্যা?

১৬) আল্লাহ এক,রাসুল(সা:)এক,মাযহাব চারটা কেন?

১৭) সহীহ বুখারীর অনুসরণ মূলত ইমাম বুখারীর ফিকহী মাযহাবেরই অনুসরণ।

১৮) দলীল পর্যালোচনার প্রাথমিক মূলনীতি।

১৯) যেমন ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দ- (১,২)

২০) "হাদিস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব" ইমামগণ এই কথা আসলে কাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন?

২১) সালাফের ইলম অর্জনের পদ্ধতি।

২২) সালাফের শিক্ষাদান পদ্ধতি।

২৩) ইমামগণের অন্তরে হাদীসের মর্যাদা কেমন ছিল?

২৪) হাদীস সহীহ হলেই কী সব ইখতেলাফ নিরসন হয়ে যাবে?

২৫) প্রসঙ্গ:ফিকহে হানাফীর সনদ"।

২৬) কুরআন কী এতই সহজ যে, সাধারণ পাঠক নিজে নিজেই বুঝে নিতে পারবে?

২৭) হানাফীরা কি হাদিসের বিরোধিতা করে?

২৮) হুফফাজে হাদীস মুহাদ্দিসীনদের চোখে ইমাম আবু হানিফা রহ.

২৯) আলেম-উলামারা কি শরীয়তের ঠিকাদারী নিয়েছেন?

৩০) মক্কী সূরা-মাদানী সূরা: পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য।

৩১) সাহাবাদের সম্পর্কে কী আকীদা রাখা চাই?

১) যেমন ছিল নবীযুগের মাদ্রাসা।

কিবলা পরিবর্তনের পর যখন মসজিদে নববীকে বাইতুল্লাহের দিকে ফেরানো হয় তখন প্রথম কিবলার দিকের দেয়াল ও তৎসংলগ্ন জায়গাটি গৃহহীন গরীব দুঃখীদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।এ জায়গাটিই পরবর্তীতে "সুফফা"নামে প্রসিদ্ধ হয়।

প্রচন্ড দারিদ্র্য সত্ত্বেও এই মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালার কালাম ও নবীজীর বাণী শোনার জন্য দিনরাত মসজিদে নববীতে পড়ে থাকতেন। চাষাবাদ বা ব্যবসা-বাণিজ্য কোন কিছুর সাথেই তাঁদের বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা ছিল না। ইলমেদ্বীন অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সমাজে তাঁরা "আসহাবে সুফফা" বলে পরিচিত ছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, তাদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়ত ছিল কেবল লুঙ্গি কিংবা ছোট চাদর, যা তার ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। (নীচের দিকে) কারো নিস্‌ফে সাক বা হাঁটু পর্যন্ত আর কারো টাখনু পর্যন্ত ছিল।

তারা লজ্জাস্থান দেখা যাবার ভয়ে কাপড় হাত দিয়ে ধরে রাখতেন। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪২)

হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা" রা: বলেন,আমিও আসহাবে সুফফার একজন ছিলাম। আমাদের কারো কারো কাছে পুরো একটি কাপড়ও ছিল না। ঘামের দরুন শরীরে সবসময় ময়লা জমে থাকত।(হিলয়াতুল আউলিয়া)

তাঁরাই ছিলেন হাদীসে বর্ণিত أشعث و أغبر তথা ধুলোমলিন,উস্কোখুস্কো চুলওয়ালা এর বাস্তব নমুনা যাদের ব্যাপারে ঘোষণা হয়েছে,যদি এরা আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বলে ফেলে তাহলে আল্লাহ অবশ্যই সেটা পূরণ করেন।

হযরত মুজাহিদ রহ.বলেন,হযরত আবু হুরায়রা রা:বলতেন,ঐ সত্বার কসম যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই,ক্ষুধার জ্বালায় প্রায়ই আমি পেট মাটির সাথে মিশিয়ে রাখতাম(যাতে মাটির শীতলতার দরুন ক্ষুধার উত্তাপ কিছুটা লাঘব হয়)।আবার অনেক সময় পেটে পাথর বাঁধতাম যেন কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারি"।

মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ.বলেন,"যখন সন্ধ্যা হত তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহাবে সুফফাদের সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ভাগ করে দিতেন।(অনেকটা লজিংয়ের মতো)কেউ দুজনকে নিয়ে যেত,কেউ তিনজনকে।হযরত সাদ বিন উবাদা রা: আশিজনকে বাসায় নিয়ে খাবার খাওয়াতেন।"(ওয়াফাউল ওয়াফা)

এছাড়া মসজিদে নববীতে দুটি খুঁটিতে দড়ি বাঁধা ছিল।আনসার সাহাবীগন নিজ নিজ ক্ষেত থেকে শস্য,খেজুর,খাসি এনে সেখানে ঝুলিয়ে রাখত। সুফফাবাসীরা লাকড়ি সংগ্রহ করে সেগুলো রান্না করে খেতেন।মুয়াজ ইবনে জাবাল রা:এখানকার ব্যবস্থাপনার জিম্মাদার ছিলেন।(ওয়াফাউল ওয়াফা)

আসহাবে সুফফাদের সংখ্যায় কম-বেশী হত।আরেফে জামান সোহরাওয়ার্দী রহ.তাঁর কিতাব "আওয়ারিফে" লিখেছেন"আসহাবে সুফফার সংখ্যা ৪০০তে গিয়ে ঠেকেছিল।"

ইমাম আবু আব্দুর রহমান সুলামী,ইবনুল আরাবী,হাকিম,আবু নুয়াইম রহ. আসহাবে সুফফার নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

আসহাবে সুফফার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন:

১.আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা:।

২.আম্মার বিন ইয়াসার রা:।

৩.আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা:।

৪.মিকদাদ বিন আমর রা:।

৫.খাব্বাব ইবনুল আরাত্ব রা:।

৬.বেলাল বিন রবাহ রা:।

৭.যায়দ ইবনুল খাত্তাব রা:।

৮.আবু যর গিফারী রা:।

৯.আব্দুল্লাহ বিন উমর রা:।

১০.সালমান ফারসী রা:।

(সীরাতে মুস্তফা,৪৩৪-৪৩৮. মাওলানা ইদরীস কান্দলভী রহ.)

যুগে যুগে আসহাবে সুফফাগনই দ্বীনি ইলম চর্চাকারীদের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন।সম্পদ অর্জনের পেছনে সময় দিতে না পারার কারণে দারিদ্র্য তাঁদের পিছু ছাড়ত না। কিন্তু এরপরও অন্যান্য ধনী সাহাবীদের তুলনায় তাঁরা সবর ও শোকরের জিন্দেগী যাপন করতেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে তাঁদের কাতারে শামিল করে নিন।আমীন।

২) ইমাম আবু হানিফা রহ.এর চমৎকার একটি ঘটনা।

১.

ইমাম আবুল কাসিম ইবনু আবিল আওয়াম বলেন,আমি আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালামাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,আমি মুহাম্মাদ বিন আব্বাস বিন রবী ও আহমাদ বিন আবু ইমরানকে বলতে শুনেছি তারা বলেছেন, ইসমাইল

বিন মুহাম্মাদ বলেন, একবার আমার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে আমি সন্দিহান হয়ে গিয়েছিলাম(তালাক দিয়েছি কিনা)।তো শরীক বিন আব্দুল্লাহ রহ.এর কাছে গিয়ে ঘটনা বলে সমাধান চাইলাম।তিনি বললেন,স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও আর আমাদেরকে সাক্ষী রেখে রজআত করে নাও(ফিরিয়ে নাও)।

এরপর আমি সুফিয়ান সাওরী রহ.এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,যদি তুমি তালাক দিয়েও থাকো, তারপরও ইতোমধ্যেই তাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়েছো।

এরপর যুফার বিন হুযাইল রহ.এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম,তিনি বললেন,যতক্ষন পর্যন্ত তুমি তালাকের ব্যাপারে নিশ্চিত না হচ্ছো ততক্ষন পর্যন্ত সে তোমার স্ত্রী হিসেবেই বহাল রয়েছে।(তালাক হয়নি)

ইসমাইল বলেন, এরপর আমি ইমাম আবু হানিফা রহ.এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম এবং আগের তিন ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করলাম।আবু হানিফা রহ.বললেন, সুফিয়ান সাওরী যে ফতোয়া দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল সর্তকতামুলক,আর যুফার যে ফতোয়া দিয়েছেন সেটা আসল ফিকহি মত।আর শরীকের বক্তব্যটা হলো অনেকটা এমন, একজনকে তুমি জিজ্ঞেস করলে যে আমার কাপড়ে পেশাব লেগেছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহে পড়ে গেছি, এখন করনীয় কী? উত্তরে সে বলল,(আগে)কাপড়ে পেশাব কর,এরপর ধুয়ে ফেল।(ফাযায়েলে আবু হানিফা,৯২)

২.

অনেক ভাই মনে করতে পারেন শুধু হাদীসের কিতাবেই সনদ থাকে আর হাদীস বা সর্বোচ্চ সাহাবা-তাবেয়ীনদের বক্তব্যগুলোই কেবল সনদসহ পাওয়া যায়।আর কিছুতে সনদ লাগে না বা সনদ নেই। অথচ বিষয়টি এমন নয়।সব যুগের উলামাগনই সনদের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর চর্চাও করেছেন।(যদিও অনেক ক্ষেত্রেই সনদ এখন আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে।)

ফিকহ-ফতোয়া,ইমামদের ঘটনা, ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়,রাবীদের জীবনী তথা ইলমে দ্বীনের সব কিছুই সনদসহ সংরক্ষিত রয়েছে। পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তীদের পক্ষ থেকে এর চাইতে বড় অনুগ্রহ আর কিইবা হতে পারে?!

আল্লাহ তায়ালা সবযুগের আহলে ইলমদের মেহনতকে কবুল করুন। তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন।আমীন।

৩) উলুমুল হাদীস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আছে এমন যে কেউ জানেন "খবর বা হাদীস মুলত দুই প্রকার।মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ।

হাদীসটি যদি এই পরিমাণ রাবী বর্ণনা করেন যাদের সম্মিলিতভাবে মিথ্যা বর্ণনা করাটা অসম্ভব,যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তাহলে সেটি হল মুতাওয়াতির।

আর এই পরিমাণ রাবীর বর্ণনা না পাওয়া গেলে সেটি খবরে ওয়াহিদ।

আমরা যে বিভিন্ন সময় হাদিসের সহীহ-যয়ীফসংক্রান্ত আলোচনা করি এসবই কিন্তু খবরে ওয়াহিদ কেন্দ্রীক।মুতাওয়াতির হাদীসের সহীহ-যয়ীফ নিয়ে ইলমুল ইসনাদে কোন আলোচনা হয় না।কারণ সহীহ-যয়ীফ নিয়ে আলোচনা হয়ই হাদীসটি গ্রহন বা পরিত্যাগ করার জন্য।আর মুতাওয়াতির তো বিনা দ্বিধায় নিশ্চিতরূপে গ্রহনযোগ্য।(মাবাদি উলুমুল হাদীস,৭০)

এখন ধরুন কেউ প্রশ্ন করল কুরআন মাজিদের অমুক আয়াতটি কোন সহীহ হাদিসে আছে?দেখা গেল আপনি সহীহ হাদীসে সেই আয়াতটি পাচ্ছেন না।এটা মোটেও কোন ভাবনার বিষয় নয়।

কারন কুরআনের আয়াতগুলো হলো মুতাওয়াতির। সেগুলো প্রমানের জন্য সহীহ হাদীসের প্রয়োজনই নেই।তবে হ্যাঁ,যদি পাওয়া যায় তাহলে ভালো, নাহলেও সমস্যা নেই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইধরনের মুতাওয়াতিরের সুনির্দিষ্ট সনদ পাওয়া কঠিন।(মাবাদি,৯১)

২.

এখন আসুন এর কাছাকাছি ভিন্ন আরেকটি বিষয় আলাপ করি।উলুমুল হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ.তাঁর রচিত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন,"যে নববীশিক্ষা সাহাবা যুগ থেকে ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে,মারফুয়ে হুকমীর মাধ্যমে,ইজমায়ে সাহাবা বা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহর ভিত্তিতে পরবর্তীদের নিকট পৌঁছেছে,তা মৌখিক বর্ণনাসূত্রে আসার প্রয়োজন থাকেনা।এসব ক্ষেত্রে কখনো মৌখিক বিবরণ সহীহ সনদে বিদ্যমান থাকে,কখনো যয়ীফ সনদে,কখনো একেবারেই না"।(ফাতহুল বারী ইবনে রজব,৬/১২৪)

তারাবীর রাকাত সংখ্যা নিয়ে প্রতি বছরই কিছু ভাই বিতর্ক সৃষ্টি করেন।সহীহ হাদীসে ২০রাকাত তারাবীর দলীল কোথায়?

নানা আঙ্গিকে এধরনের প্রশ্ন তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়।

অথচ হযরত উমর রা. এর খেলাফতকাল থেকে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যমতের ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত বিশ রাকাত তারাবী পড়া হয়ে আসছে। উম্মতের এ অবিচ্ছিন্ন কর্মধারাই প্রমাণ করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম বিশ রাকাতের তালিমই পেয়েছেন।

সুতরাং যেখানে ইজমা,তাওয়াতুর,তাওয়ারূস তথা বিপুলসংখ্যক সাহাবীর আমল পাওয়া যাচ্ছে সেখানে মৌখিক বিবরণসম্বলিত সহীহ হাদীস তথা খবরে ওয়াহিদের প্রয়োজনই বা কতটুকু?

বরং উপরোক্ত প্রিন্সিপল বা মুলনীতি অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে মৌখিক বিবরণ কখনো সহীহ সনদে থাকে,কখনো যয়ীফ সনদে,কখনো একেবারেই থাকে না।

ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ.বলেন,"কোন বিষয়ে লোকদের ইজমা আমার কাছে "ইবনে মাসউদ থেকে আলকামা থেকে ইব্রাহীম থেকে মানসুর থেকে সুফিয়ান"

(এটি খবরে ওয়াহিদের সবচেয়ে সহীহসনদের একটি) থেকে উত্তম"।(কিফায়াহ,৪৬৬)

দলীল পর্যালোচনার আগে এই প্রাথমিক ভিত্তিমুলক কথাগুলো মাথায় ভালোভাবে বসিয়ে নিলে অনেক কিছুই স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

৪) প্রশ্ন: হুজুর যা বলে সব তো ইমামদের কথাই বলে,আপনারা এতো ফিতনা ফিতনা করেন ক্যান?

উত্তর: নিজের মনমতো কখনো এই ইমাম কখনো ঐ ইমামের ছাড়(رخصة) ও বিচ্ছিন্ন(شاذ) মত গ্রহন করার নামই ফিতনা।

সুলাইমান তাইমী বলেন,"যদি তুমি ইমামদের সকল রুখসত জমা কর,তাহলে যাবতীয় অকল্যান তোমার মধ্যে জমা হবে"। ইবনু আব্দিল বার রহ.এর সাথে যোগ করে বলেছেন,এটার উপর উলামাদের ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে।(জামিউ বয়ানিল ইলম)

ইমাম বায়হাকী রহ. ইসমাইল কাযীর ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,একবার আমি খলীফা মু'তাদ্বিদ বিল্লাহর দরবারে গেলাম।

তিনি আমাকে একটা কিতাব দিলেন।আমি পড়ে দেখলাম সেখানে উলামায়ে কেরামের বিচ্ছিন্ন মতগুলো একত্রিত করা হয়েছে।

আমি বললাম,এটা তো ধর্মদ্রোহী লেখকের কিতাব।কারণ যিনি নাবীয(খেজুরের রস থেকে তৈরি পানীয়)কে জায়েয বলেছেন তিনি মুতআ বিবাহর অনুমতি দেননি।আবার যিনি মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন তিনি গান-বাজনার অনুমতি দেননি।আলেম মাত্রই তার টুকটাক বিচ্ছিন্ন মত রয়েছে।

যে ব্যক্তি উলামাদের বিচ্ছিন্ন মতসমুহকে গ্রহণ করবে তার দ্বীনদারী নষ্ট হয়ে যাবে।এরপর খলীফা সেই কিতাবটা পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন"।

(ফাতহুর রব্বানী,২১৫)

৫) "কেউ যখন অন্যজনের শাস্ত্রে অনধিকার চর্চা করে তখন সে নানা আজব ঘটনার জন্ম দেয়"।-ইমাম ইবনে হাজার রহ.

১.

একবার এক মজলিসে ইমাম আ"মাশ রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.কে একেক করে মাসআলা জিজ্ঞেস করছিলেন আর তিনি জবাব দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে আ"মাশ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,আপনি এগুলো কিসের ভিত্তিতে বলছেন?(এগুলোর দলীল কী?)

তখন আবু হানিফা রহ.বললেন,আরে আপনিই তো ইবরাহিম থেকে অমুক হাদীস,শা"বী থেকে অমুক হাদীস শুনিয়েছিলেন!(সেগুলোর ভিত্তিতেই এই মাসআলাগুলোর সমাধান বের হয়ে আসে)

তখন আ"মাশ বললেন,হে ফকীহ সম্প্রদায়!আপনারা হলেন (রোগ নির্ণয়কারী) চিকিৎসক,আর আমরা তো (কেবল) ওষুধ সরবরাহকারী!

(কিতাবুস সিকাত,জামিউ বয়ানিল ইলম,আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

আরেক বর্ণনায় আছে,আ"মাশ আরো বলেন,"আর আপনি তো উভয় শাখায়(হাদীস,ফিকহ)বুৎপত্তি অর্জন করেছেন!

আরেকবার ইমাম আহমাদ রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক অমুক মাসআলায় সমাধান কী?তিনি জবাব দিলেন, তখন ইমাম আহমাদ জিজ্ঞেস করলেন,আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন?এই বিষয়ে কি কোন আয়াত বা হাদীস আছে?

এর উত্তরে ইমাম শাফেয়ী একটি সরীহ বা সুস্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করলেন"। (মানাকিবে শাফেয়ী সুত্রে আসারুল হাদীসিশ শরীফ,১২৪)

২.

আমাদের আকাবিরের সারেতাজ হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.এর প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে যে,"তিনি কোন এক মাসআলা দেখার জন্য ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ.এর "তাফসীরে কাবীর" আনিয়েছিলেন।

সংশ্লিষ্ট জায়গা পড়ার পর তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল যে,আমরা ইমাম রাযীকে তো অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন মনে করতাম কিন্তু এখন মনে হল যে, তাঁর চিন্তা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তো খুব চলে, কিন্তু গভীরে কম চলে।"

("মাজালিসে হাকীমুল উম্মত"সূত্রে তালিবানে ইলম:পথ ও পাথেয়,১০৭)

৩.

উল্লিখিত ঘটনাগুলো বুঝে পড়লে যে কেউ উপলব্ধি করবে যে,একেক ফুলের যেমন একেক ঘ্রাণ ও সৌন্দর্য,ঠিক তেমনি আহলে ইলমদের মাঝেও বৈচিত্র্য রয়েছে। বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়েও কারো জ্ঞানের গভীরতা কম হতে পারে,আবার বিস্তৃত জ্ঞান ছাড়াও কেউ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু নিজ নিজ অঙ্গনে উভয় শ্রেণীই স্মরণীয় ও বরণীয়।

উলামাদের মধ্যে কেউ হাদীসের আকাশের নক্ষত্র,কেউ ফিকহের ময়দানের শাহসওয়ার,কেউ আবার ওয়াজের ময়দানে কিংবদন্তি জনপ্রিয়তার অধিকারী।

কিন্তু সমস্যাটা তখনই হয় যখন আমরা কাউকে তাঁর নিজ অঙ্গনের বাইরে টেনে আনি।

যেমন আজকাল একটা কুপ্রবনতা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে।ওয়াজ,ধর্মীয় লেকচার বা লেখনীতে একটু জনপ্রিয় বা "ভাইরাল" হলেই মানুষ তার কাছ থেকে সবকিছু পেতে চায়।অথচ একজন মানুষের পক্ষে শরীয়তের সব শাখায় সমান বুৎপত্তি অর্জন করা অসম্ভব। বিশেষত ওয়ায়েজদের প্রচন্ড ব্যস্ততার দরুন জটিল বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করে মতামত দেয়ার ফুরসত তারা খুব কমই পান। কিন্তু দাওয়াহ'র মুলনীতির বাইরে গিয়ে-চক্ষুলজ্জার কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণে-যখন তারা স্পর্শকাতর বিষয়ে মুখ খোলেন তখন সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে।

তাই জনপ্রিয় ওয়ায়েজ, কলামিস্ট -হাজার হাজার মানুষ যাদের অনুসরণ করে-সর্বপ্রথম তাদেরই এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে উলামায়ে কেরামের কর্মক্ষেত্রের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বুঝাতে হবে।

নচেৎ আল্লাহ না করুন ঐ হাদীসের আওতায় পড়ে যাওয়ার সমুহ আশঙ্কা রয়েছে যেখানে নবীজী(সা:)ভবিষ্যতবাণী করেছেন,"যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে না জানলেও ফতোয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে , এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।"(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১০০)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সবধরনের গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন। দ্বীনি ইলম দ্বীনি তরিকায় চর্চা করার তাওফীক দান করুন।আমীন।

৬) "যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে বিতর্কের ক্ষেত্র বানায় তার ঘন ঘন তানাক্কুল তথা মাযহাবের স্থানান্তর ঘটে।"- খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.(সুনানে দারেমী)

মাযহাব ভিত্তিক পর্যালোচনা- ০২

প্রশ্ন: "আমি ধর্মীয় বিধান দলীলের আলোকে গ্রহন করতে চাই।কোন মাসআলায় যদি ইমাম আবু হানিফা রহ.এর মতের তুলনায় ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মতটি দালিলিকভাবে শক্তিশালী মনে হয় তাহলে তা গ্রহন করতে কি কোন সমস্যা আছে?

উত্তর: তানাক্কুল তথা এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে গমনের চারটি সুরত বা চিত্র হতে পারে।

১.

হয়তোবা দ্বিতীয় মাযহাবের পুরোপুরি তাকলীদের জন্য। যৌক্তিক কারনে এটার সুযোগ আছে।

২.

সকল মাযহাবের ছাড়গুলো গ্রহনের জন্য।এটা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ।এর দ্বারা ব্যক্তির দ্বীনদারী ধ্বংস হয়ে যায়।

৩.

সুনির্দিষ্ট কোন মাসআলায় গবেষণার ভিত্তিতে অন্য মাযহাবের মত গ্রহন।এটা নির্ভর করে গবেষকের উপর।দুটি গুণের অধিকারী হলে তিনি এমনটি করতে পারবেন।

ক.মুজতাহিদ ইমামগণের দলীল পর্যালোচনা করে প্রাধান্য দেয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে এবং আহলে ইলমের কাছে তাঁর যোগ্যতা স্বীকৃত হতে হবে।

খ.পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে হবে।

এই শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভিন্নমত গ্রহনের সুযোগ আছে। বরং এটা ফিকহে ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য।ইমাম নববী,ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল ক্যায়িম, ইবনুল হুমাম প্রমুখের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে।

৪.

কিন্তু যদি তিনি দলীল পর্যালোচনার যোগ্য হিসেবে আহলে ইলমের কাছে স্বীকৃত না হন তাহলে এই ধরনের প্রবনতা হল অবাধ্যতা ও অহেতুক তর্ক যেমনটি আজকালকার কোন কোন আলেম করে থাকেন।

"সহীহ হাদীস",দলীল অনুসরণ"সহ যত সুন্দর সুন্দর শিরোনামই দেয়া হোক না কেন এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এই প্রবনতার দরুন সে এক মাসআলায় হানাফী থেকে শাফেয়ী,আরেকটাতে শাফেয়ী থেকে মালেকী,

এরপর হাম্বলী এভাবে চার মাযহাব বরং চল্লিশ মাযহাব থেকেও বের হয়ে যাবে।

(আসারুল হাদীসীশ শরীফ,১১১-১১৩)

এবার একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। ধরুন! কেউ "নামাযে দেখে তেলাওয়াতের"মাসআলায় হানাফী মাযহাব থেকে বেরিয়ে আপন বুঝ অনুযায়ী শাফেয়ী,মালেকীপ্রমুখের মতকে প্রাধান্য দিলেন।

এরপর "উমরী কাযা"র মাসআলায় জুমহুর আইম্মা তথা আবু হানিফা,আহমাদ,মালেক,শাফেয়ী (গ্রহনযোগ্য মতানুযায়ী)এর মত থেকেও বেরিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া,বিন বায রহ.এর মত গ্রহন করলেন।

আর "নেক্বাব"তথা নারীদের মুখ ঢাকার মাসআলায় তো সকল মাযহাবের ঐক্যবদ্ধ মত থেকেই বেরিয়ে গেলেন।

এখন তার এই তানাক্কুল তথা দলিল অনুসরণের নামে এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবের মতগ্রহন নিয়ে যদি প্রশ্ন, বিতর্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তাহলে সেটা কি খুব অস্বাভাবিক কিছু হবে?তিনি যা করছেন সেটা কি আশংকাজনক নয়?

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই ধরনের প্রবনতা থেকে রক্ষা করুন।সাবীলুল মুমিমীন অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমীন।

৭) জাল হাদীস মোকাবেলায় মুহাদ্দিসীনে কেরামের অবদান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের অধিকাংশ সময় জুড়ে মানুষের মাঝে সততা-দ্বীনদারী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসা-বাণিজ্য,

ক্ষেত-খামার করতেন: সরাসরি সব হাদীস রাসুল (সা:) থেকে শোনার সুযোগ পেতেন না।অন্যদের কাছে থেকে শুনে নিতেন। কিন্তু তখন কেউ মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন না।

৩৫হিজরীতে যখন উসমান রা: শহীদ হলেন তখন কতিপয় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের আবির্ভাব ঘটল। পাশাপাশি হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনায় নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল।ফলে সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলেন।

এবিষয়টিই ফুটে উঠেছে বিশিষ্ট তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ.এর বর্ণনায়,"তাঁরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না।যখন ফিতনাহ (উসমান রা:কে হত্যা)ঘটল তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের বর্ণনাকারীর নাম বলো?এরপর আহলুসসুন্নাহর হাদীস গ্রহন করা হতো নচেৎ পরিত্যাগ করা হতো।"(মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

রাজনৈতিক স্বার্থ, ইসলাম বিদ্বেষ,গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা, আজগুবি ওয়াজ-নসীহত,মাযহাবী ইখতেলাফ,আমলে উৎসাহ প্রদান,রাজন্যবর্গের নৈকট্য লাভসহ নানা অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হাজার হাজার হাদীস জাল করা হয়েছিল।

একবার খলীফা হারুনুর রশিদের দরবারে এক ধর্মদ্রোহী হাদীস জালকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হল।সে বলল,আমাকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে?খলীফা বললেন, তোমার অনিষ্টতা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য।সে বলল,আমি যে একহাজার/(মতান্তরে)চার হাজার হাদীস জাল করে ছড়িয়ে দিয়েছি সেগুলোর অনিষ্ট থেকে কে বাঁচাবে?খলীফা বললেন,ওহে আল্লাহর শত্রু!আবু ইসহাক ফাযারী ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক থাকতে পেরেশানী কিসের?

তাঁরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে জাল হাদীসগুলোর প্রতিটা অক্ষর হাদীস ভান্ডার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন"।(তাযকিরাতুল হুফফাজ)

জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসীনে কেরাম আটটি মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১.

ইসনাদ বা হাদীসের সূত্র বর্ণনার পদ্ধতি প্রবর্তন।ইবনে সিরীন রহ.বলেছিলেন,নিশ্চয় এই ইলম(হাদীস) দ্বীন, সুতরাং এটা কার কাছ থেকে গ্রহন করছো তা যাচাই কর"।

২.

হাদীস বর্ণনাকারীদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ সংরক্ষণ।এর ফলে মিথ্যুকরা উল্টাপাল্টা তথ্য দিয়ে ধরা পড়ে যেত।হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.বলেন,যখন থেকে রাবীরা মিথ্যা বলা শুরু করল তখন থেকে আমরা "তারিখের সহায়তা নিতে লাগলাম"।

৩.

গ্রহনযোগ্যতার বিচারে রাবীদের শ্রেণীবিন্যাস।

৪.

হাদীসের টেক্সট বা মুলপাঠ যাচাই করে দেখা হত এটা কুরআন বা অন্যান্য হাদীসের বিপরীত কিনা।

৫.

বর্ণনাকারীদের চরিত্র যাচাই।এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে স্মরণশক্তি ও সততা(মিথ্যুক বা বিদআতী নয়)এই দুটি গুণ লক্ষ্য করা হয়।

৬.

ইলালুল হাদীস বা হাদীসে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত ভুলগুলো শনাক্তকরণ।জয়ীফ রাবীদের হাদীসে ভুল থাকাটা স্বাভাবিক ও স্পষ্ট কিন্তু সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীসে সাধারণত ভুলটি সুপ্ত থাকে যেটি কেবল উঁচু পর্যায়ের ইমামগনই শনাক্ত করতে পারেন।

৭.

উপরে বর্ণিত ইলমগুলোর বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যবহৃত

পরিভাষা সংক্রান্ত শাস্ত্র।যেটি "ইলমু মুসতালাহিল হাদীস" নামে পরিচিত।

৮.

প্রচলিত জাল হাদীসের সংকলন তৈরি।এর উদ্দেশ্য ছিল যেন এই হাদীসগুলো চিহ্নিত হয়ে যায় এবং এগুলোর শুরুতে সনদ লাগিয়ে কেউ যেন তা সহীহ বলে চালিয়ে দিতে না পারে।(লামাহাত মিন তারিখিস সুন্নাহ)

মিথ্যুকরা যদিও দ্বীনের ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরামের অহর্নিশ পরিশ্রমের ফলে বিষয়টা উল্টো হয়ে গেছে।নবীজীর প্রকৃত শিক্ষা সর্বোন্নত পদ্ধতিতে প্রশ্নাতীতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে।

৮) জাল হাদীস: পরিচয় ও কিছু সাধারণ লক্ষণ।

হাদীস এর আভিধানিক অর্থ "কথা" ; পরিভাষায় হাদিস বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী তার শিক্ষা ও হেদায়েত এবং তার কর্ম ও অবস্থা সমূহকে বুঝানো হয়। তাই একথা সুস্পষ্ট যে জাল হাদিস আসলে হাদীসই নয়।

তবুও আমরা কথা প্রসঙ্গে যেমনি ভাবে "জাল টাকা" জাল দলীল" বলে থাকি ঠিক তেমনি"জাল হাদীস" শব্দটি সহজে বোঝাতে ব্যবহার হয়।

জাল-হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত।

১.

যার অর্থ ও বিষয়বস্তুই বাতিল। যেগুলো নবীর কথা হওয়াটা কল্পনাই করা যায় না। যে কেউ শুনলেই বুঝতে পারে, এটা কখনোই নবীজির বাণী হতে পারে না।

২.

ঐসকল সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও হিকমতপূর্ণ বাণী যেগুলো বাহ্যত খুব চমকপ্রদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। জালিয়াতরা হাদিস জাল করার কৌশল হিসেবে সুন্দর বাক্যের আশ্রয় নিয়েছে।

এই প্রকার জাল বর্ণনা সাধারণত বেদীন ওয়ায়েজ,বেদীন পীর দরবেশ ও গল্পবাজরা বয়ান করে বেড়ায়।

উভয় প্রকার বর্ণনাই জাল ও ভিত্তিহীন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের জাল বর্ণনাগুলো বেশি ক্ষতিকর।

কেননা এগুলোকে ত্যাগ করতে বলা হলে অজ্ঞ লোকেরা আপত্তি করে বলে হাদীস মওযু হলেও কথা তো সত্য। তাইলে বলতে সমস্যা কি?

এজন্য সাধারণ মানুষ এটা নিয়ে ধোঁকায় পড়ে যায়।

কিন্তু বাস্তব কথা হলো মিথ্যা তো মিথ্যাই,বাহ্যত সেটা যত সুন্দরই হোক না কেন। নবীজি যেটা এরশাদ করেন নি সেটা যত ভালোই মনে হোক না কেন সেটাকে তাঁর বাণী বলা জায়েজ হবে না। কেননা এতে দুটি বড় ধরনের দ্বীনবিকৃতি ঘটে।

১.পরোক্ষ ভাবে এটা তাঁর উপর দোষারোপ,যে এই ভালো কথাটি বলা উচিত ছিল কিন্তু তিনি বলে যাননি আমি বলে দিলাম।

২.

তাছাড়া আল্লাহতায়ালা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এখন আর কারো পক্ষ থেকে সংযোজনের প্রয়োজন নেই। কেউ যদি কোন ভালো কথা নবীজির নামে সংযোজন করতে চায় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় দ্বীন কিছুটা অপূর্ণ ছিল এখন সে এসে পূর্ণ করে দিল। নাউজুবিল্লাহ।

জাল হাদিস চেনার কিছু সাধারণ সূত্র:
১. বাক্যটি এত অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া যে এটি নবীজি (সা:)এর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। যেমন- "কেউ যদি একবার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলে তাহলে একটি পাখি সৃষ্টি হয় যার সত্তর হাজার জিহ্বা রয়েছে। প্রতিটি জিহ্বা সত্তর হাজার ভাষায় তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"

২. বাক্যটি যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হয়। যেমন "বেগুন যে উদ্দেশ্যে খাওয়া হয় তা পূরণ হয়।"

৩. হাদিসে যদি নির্ধারিত তারিখ থাকে। যেমন অমুক অমুক সালে অমুক অমুক ঘটনা ঘটবে।

৪.বাক্যের ভাষা যদি অতিনিম্নমানের হয়। যেমন -"চারটি জিনিস চারটি জিনিস থেকে তৃপ্ত হয় না। নারী-পুরুষের থেকে, জমিন বৃষ্টি থেকে, চোখ নজর দেওয়া থেকে, কান খবর শোনা থেকে।"

৫. বিভিন্ন শ্রেণীকে নিন্দা করে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন তুর্কি জাতির নিন্দা, নপুংসকদের নিন্দা, মামলুকদের নিন্দা,সুদানী ও হাবশীদের নিন্দা।

বি:দ্র: এসকল লক্ষণের উপর ভিত্তি করে কোন বর্ণনাকে জাল বা ভিত্তিহীন বলে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। রোগের লক্ষণ পাওয়া গেলে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয়, ঠিক তেমনি এগুলো(সহ অন্যান্য লক্ষণগুলো) পাওয়া গেলে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তাহকীক করে নিশ্চিত হতে হবে।

৯) সহীহ হাদীস: ভ্রান্তি ও প্রান্তিকতা।

ইজমা ও তাওয়াতুরে আমালী,সহীহ হাদীস,জয়ীফ হাদীস। শরীয়তের তিনটি উৎস। গ্রহনযোগ্যতার বিচারে তারতম্য থাকলেও প্রত্যেকটির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও মর্যাদা। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো আমাদের দেশসহ সারাবিশ্বেই এক শ্রেণীর মুসলিম ভাইদের মাঝে "সহীহ হাদীস"কেন্দ্রিক অতি উৎসাহ কাজ করে।ইমামগণ সহীহ হাদীসের অনুসরণ করতে বলেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে এটাকে কেন্দ্র করে এতোটা বাড়াবাড়ি করা যার দরুন শরীয়তের অন্য মুলনীতিগুলোর অবমূল্যায়ন বরং

ক্ষেত্রবিশেষে অবমাননা হয়ে যায়, এমন আচরণের কথা নিশ্চয় কেউ বলেননি।

এবার এই তিন পরিভাষার খোলাসাটা বলি।ইজমা ও তাওয়াতুরে আমালী বলা হয়"কোন একটি বিষয়ে উম্মতের ইমামগণ ঐক্যমতে পৌঁছা বা তাঁদের প্রতক্ষ্য-পরোক্ষ সমর্থনে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে সেটির চর্চা থাকা।"

আর সহীহ ও যয়ীফ হাদীস উভয়টিই মুলত খবরে ওয়াহিদের প্রকার। অর্থাৎ যেটি অল্প সংখ্যক রাবী উদাহরণ স্বরূপ এক-দুইজনের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পার্থক্য হলো সহীহ হাদীসের সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে যয়ীফ হাদীসের রাবীদের সবাই অথবা কেউ কেউ নির্ভরযোগ্যতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হন।

আশাকরি পাঠক বন্ধুরা ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে,সহীহ হাদীসের সনদ যত শক্তিশালীই হোক না কেন দিনশেষে সেটা খবরে ওয়াহিদ।তাই সেটির মর্যাদা যয়ীফ হাদীসের ঊর্ধে হলেও ইজমা ও তাওয়াতুরের নীচে।

প্রান্তিকতার প্রথম দিক:
ইজমা ও তাওয়াতুরে আমালীর অবমূল্যায়ন।

সহীহ হাদীসকে তারা এত ঊর্ধ্বে স্থান দেন যে,এর বিপরীতে অনেক সময় ইজমা ও তাওয়াতুরে আমালীকেও মানতে চাননা,সহীহ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে বসেন।অথচ ইমামগণ খবরে ওয়াহিদের উপর ইজমা ও তাওয়াতুরে আমালীকে প্রাধান্য দিতেন।

ইমাম রবীআ ইবনে আবু আব্দুর রহমান (১৩৬হি:),ইমাম মালেক রহ.এর বিশিষ্ট উস্তাদ,মদীনার মুজতাহিদ ইমাম। তিনি বলেছেন, "হাজার থেকে হাজার লোকের সূত্রের বর্ণনা(তাওয়াতুরে আমালী তথা অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা)আমার কাছে একজন থেকে একজনের সূত্রের বর্ণনা(খবরে ওয়াহিদ)থেকে অধিক প্রিয়।"(তারতিবুল মাদারিক)

ইমাম শাফেয়ী রহ.(২০৪হি:)বলেন,"খবরে ওয়াহিদের তুলনায় ইজমা অধিক গুরুত্বপূর্ণ"।(কিফায়া,৪৬৯)

ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.(১৮১হি:)বলেন, "কোন বিষয়ে মানুষের ইজমা(ঐক্যমত) আমার কাছে সুফিয়ান থেকে মানসুর, থেকে ইব্রাহীম থেকে আলকামা থেকে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এর বর্ণনা থেকেও অধিক নির্ভরযোগ্য।"(কিফায়াহ,৪৬৬,তিনি এখানে ইজমাকে খবরে ওয়াহিদের সবচেয়ে সহীহ সনদগুলোর একটির উপর প্রাধান্য দিলেন)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.বলেন,যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট কিতাব অথবা সুন্নতে মুতাওয়াতিরা বা সালাফের ইজমার বিরোধিতা করবে তার সাথে সেই আচরণই করা হবে যা বিদআতীদের সাথে করা হয়ে থাকে।"(মাজমুয়ুল ফাতাওয়া)

এখানে তিনি কিতাবুল্লাহ,তাওয়াতুর ও ইজমাকে একই কাতারে রেখেছেন,খবরে ওয়াহিদকে আনেননি।

প্রান্তিকতার দ্বিতীয় দিক:
যয়ীফ হাদীসের অবমূল্যায়ন ও অবমাননা।

যয়ীফ হাদীসকে তারা এতটা হালকাভাবে উপস্থাপন করেন মনে যেন শরীয়তে এটার কোন গুরুত্বই নেই।এমনকি যয়ীফ ও মওযুকে এক শিরোনামে এনে কিতাবও রচনা করেছেন।

আফসোস! অথচ মওযু হাদীস একেবারেই পরিত্যাজ্য হলেও শরীয়তে যয়ীফ হাদীসের অনেক প্রয়োগ ক্ষেত্র রয়েছে। ইমামগণ এটিকে তার অবস্থান অনুযায়ী মূল্যায়ন ও গুরুত্ব দিতেন।

যয়ীফ হাদীসের কিছু প্রয়োগ ক্ষেত্র:

১.

যয়ীফ হাদীস জুমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাগণের মতে ফাযায়েল ও মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে গ্রহন করা যায়।

আর যদি ভিন্নভাবে শক্তিশালী হয়ে হাসান বা সহীহ হাদীসের স্তরে উন্নীত হয় তাহলে আহলে ইলমের ঐক্যমতে সেটিকে আহকামের ক্ষেত্রেও গ্রহন করা যায়।

আর ইমাম আবু হানিফা, মালেক,আহমাদ,আবু দাউদ,নাসাই রহ.প্রমুখের মতে হাদীসটি যদি খুব বেশি দূর্বল না হয় এবং উক্ত মাসআলায় অন্য কোন হাদীস না থাকে তাহলে এই দুই শর্তে আহকামের ক্ষেত্রেও যয়ীফ হাদীস গ্রহনযোগ্য হয়। এমনকি ইমাম শাফেয়ীও শর্তসাপেক্ষে মুরসাল হাদীস-যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও-গ্রহন করেছেন।

২.

যয়ীফ হাদীসের মাধ্যমে বিপরীতমুখী দুই হাদীসের মাঝে তারজীহ(প্রাধান্য)দেয়া।ইমাম নববী "আলমাজমু"তে বলেছেন,"মুরসালের(একধরনের যয়ীফ) মাধ্যমে তারজীহ দেয়া বৈধ।"

৩.

কোন হাদীসে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকলে যয়ীফ হাদীসের সাহায্যে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেয়া।ইমাম বায়হাকী রহ."দালাইলুন নুবুওয়াতে"বলেছেন,সহীহ হাদীস থেকে উদ্দিষ্ট অর্থ উদ্ধারের জন্য কখনো যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।"

৪.

কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনদের ইখতেলাফ থাকলে যেকোনো একটিকে যয়ীফ হাদীসের সাহায্যে প্রাধান্য দেয়া।ইমাম ইবনে জুযাই মালেকী রহ.বলেন,"আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস থাকলে সেটার উপরই নির্ভর করতে হবে, বিশেষত সহীহ রেওয়ায়াত থাকলে"।

৫.

সহীহ হাদীসে বর্ণিত কোন বিষয়ের হেকমত বর্ণনা।আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ."মাআরিফুস সুনানে"বলেছেন,"সনদ যয়ীফ হলেও হেকমত বর্ণনার জন্য সেটি আনা যেতে পারে"।(আসারুল হাদীসীশ শরীফ,৩৬-৪১)

প্রিয় ভাই!

একজন মুমিনের দায়িত্ব হল বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত হয়ে শরীয়তের প্রতিটি বিষয়কে ইনসাফের সাথে মূল্যায়ন করা।ছোট থেকে ছোট বিষয়কেও অবহেলা না করা।আল্লাহ তায়ালা বোঝার,আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

১০) হাদীস থাকতে ফিকহের প্রয়োজন কেন?

প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে ফিকহ কাকে বলে।

ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.ফিকহে হানাফীকে "আবু হানিফার মত" তাচ্ছিল্য করতে শুনে বললেন,"তোমরা (এটাকে)আবু হানিফার মত বলো না। বরং বলো (এটা)হাদীসের ব্যাখ্যা।"(ফাজাইলে আবু হানিফা,১০১)

সুতরাং ফিকহ হল মূলত কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট বিধানাবলী ও ইসলামী ইবাদতসমূহের নিয়ম-কানুনের সুবিন্যস্ত রূপ যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের শিখিয়েছিলেন: তাঁরা তাবেয়ীগণকে এবং তাঁরা তাদের পরবর্তীদের শিখিয়েছেন। যেখানে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রের মাসায়েল বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদের অধীনে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। (নির্বাচিত প্রবন্ধ,মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফি:।)

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।আমরা প্রতিদিন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি তার তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত মাসালাসমূহ যদি আপনি হাদিসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে হাদিসের একটি-দুটি নয় ,দশ-বিশ কিতাবেও তা একসাথে পাবেন না।

নামাজের বিবরণ সংক্রান্ত হাদিস যেগুলো একশরও অধিক কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা যদি আপনি এক জায়গায় একত্র করেন তারপরও এ সংক্রান্ত মাসআলা জানার জন্য আপনাকে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হবে।

হাদীসগুলোর সহীহ-যয়ীফ নির্ণয় করা, সেগুলোর সঠিক মর্ম নির্ধারণ করা। সেগুলোর মধ্যকার বৈপরীত্য দূর করা। এবং নামাজের প্রতিটি কাজের সুনির্দিষ্ট হুকুম (ফরজ,ওয়াজিব)বের করা।

এগুলো কোন কিছুই হাদীসের কিতাবে নেই এবং এগুলো খুবই স্পর্শকাতর কাজ যা কেবল মুজতাহিদ ফুকাহায়গণের পক্ষেই আন্জাম দেয়া সম্ভব।

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.যিনি ছিলেন অনেক উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের দাদা উস্তাদ। তিনি বলেছেন, الحديث مضلة إلا للفقهاء অর্থাৎ ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস শরীফ বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ইবনুল হাজ্জ মালেকী, আল মাদখাল, ১/১২৮) তিনি আরো বলেছেন, التسليم للفقهاء سلامة في الدينঅর্থাৎ ফকীহগণের হাতে নিজেকে ন্যাস্ত করাই দ্বীন কে নিরাপদ রাখার নামান্তর। (তারীখে বাগদাদ, ৭/৫৬১)

আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, كذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديثঅর্থাৎ ফকীহগণ এমনটাই বলেছেন। আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই সবিশেষ জ্ঞাত।(দলীলসহ নামাজের মাসায়েল)

তো ফুকাহায়ে কেরাম এইসব কাজগুলো করে উম্মতের জন্য সুবিন্যাস্ত ও বিস্তারিত আকারে সংকলন করে গেছেন।

পাশাপাশি যেসকল মাসআলার আলোচনা কোরআন হাদিসের স্পষ্টভাবে নেই শরীয়তের নীতিমালার আলোকে সেই মাসআলাগুলো যুগ যুগ ধরে ফকীহগণ সংকলন করে গেছেন।

জনৈক আলিম খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন,ফিকহকে বপন করেছেন ইবনে মাসউদ রা.এতে পানি সিঞ্চন করেছেন আলকামা,এর ফসল কর্তন করেছেন ইবরাহীম,মাড়াই করেছেন হাম্মাদ,পেষণ করেছেন আবু হানিফা,খামিরা করেছেন আবু ইউসুফ,রুটি বানিয়েছেন মুহাম্মাদ রহ. আর এখন খাচ্ছে পুরো মুসলিম উম্মাহ।"(রদ্দুল মুহতার)

এই কথা তিনি ফিকহে হানাফীর ক্ষেত্রে বললেও এটি অনুসৃত অন্যান্য ফিকহের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ফিকহের এই পরিচয় পাওয়ার পর আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম,ফিকহ আসলে হাদিস থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় বরং হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং হুকুম-আহকামের সুবিন্যস্ত ও সংকলিত রূপ।তাই খোদ হাদিসের জন্য এবং সহজভাবে সঠিক পন্থায় হাদীসের অনুসরনের জন্যই ফিকহের প্রয়োজন।

আজকাল হাদীস অনুসরণের নামে ফিকহে ইসলামী ও হাদীস শরীফকে যেভাবে পরষ্পর বিপরীতমুখী করে দাঁড় করানো হচ্ছে,ফিকহের প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে এটা কখনো হাদীসের অনুসরন হতে পারে না বরং এটা একটি ঐতিহাসিক দ্বীনি সিলসিলার বিরুদ্ধাচরণ ও হাদীস অনুসরণের বিদাতী পন্থা।

১১) যেমন ছিলেন ইমামে আযম আবু হানিফা রহ.।

হাসান বিন ইসমাইল বলেন,আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,একদা আমি আমিরুল মুমিনীন হারুনুর রশিদের দরবারে ছিলাম।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দরবারে আসলে খলীফা হারুন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,"আবু হানিফার আখলাক কেমন ছিল? আমাদের কাছে একটু বিবরণ দিন।

তখন আবু ইউসুফ রহ.বললেন,হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন,

{مَا يَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيۡبٌ عَتِيۡدٌ ۱۸}

অর্থ:সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।(সুরা ক্বফ,১৮)

সে (ফেরেশতা) প্রতিটি বক্তব্যদাতার জিহ্বার কাছেই আছে।(কাজেই মিথ্যা বলার ইচ্ছা/সাহস আমার নেই)

আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে, আবু হানিফা রহ.আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করা থেকে খুবই বেঁচে থাকতেন।পার্থিব ব্যাপারে দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকতেন। দীর্ঘ সময় চুপচাপ ও সবসময় গভীর চিন্তামগ্ন থাকতেন,অযথা বকবককারী ও বাচাল ছিলেন না।

কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে যদি উত্তর জানা থাকত তাহলে শ্রুত নুসুস(কুরআন-হাদীস) অনুযায়ী অথবা(সরাসরি কুরআন-হাদীসে না পেলে)নুসুসের উপর কিয়াস করে উত্তর দিতেন।

আমি তাঁকে নিজেকে ও নিজের দ্বীনকে রক্ষাকারী,মানুষদের এড়িয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তি হিসেবেই জানি।তিনি মানুষের কেবল ভালো দিকটিই আলোচনা করতেন।

খলীফা হারুনুর রশিদ বললেন,"এটা সালিহীনদের
(নেককার)আখলাক।"(ফাজাইলে আবু হানিফা,৪৭)

ইয়াযিদ বিন কুমাইত রহ.বলেন,"ইমাম আবু হানিফা রহ.তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সহচরদের সাংসারিক অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন।

প্রয়োজন অনুপাতে কাউকে ৫০দিনার(স্বর্ণমুদ্রা)বা এর কম-বেশী করজ দিতেন(সরাসরি দিলে নাও নিতে পারে)।এরপর সেই টাকা দিয়ে কাঁচা রেশম কিনে কাপড় বানিয়ে নিজ ব্যবসায় লাগাতেন।

এরপর ঐ সহচর ও তার পরিবারের জন্য কাপড়-চোপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়ে বলতেন,"এটা তোমার ব্যবসার লাভ।আমার মাল থেকে কিছু দিচ্ছি না, বরং এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার জন্য রিযক"।(প্রাগুক্ত)

১২) ইমাম আবু হানিফা রহ. কি হাদীস কম জানতেন?

কিছু ভাইয়ের অব্যাহত প্রচারণার ফলে কারো কারো মনে এমন প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে।বাহ্যত এটা একজন ইমাম কেন্দ্রীক হলেও একই প্রশ্ন আসলে অন্যদের প্রতি এমনকি কয়েক জন বিশিষ্ট সাহাবীকে

নিয়েও করার সুযোগ থাকে এবং ইসলামের শত্রুরা এমনটা করেছেও।

এর উত্তরে যাবার আগে আমাদের বুঝতে হবে হাদীস চর্চার অর্থ কী?

উলুমুল হাদীসের পরিভাষায় হাদীস চর্চার দুটি দিক রয়েছে।

১.(التحمل)তাহাম্মুল তথা উসতাদের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ।

২.(الأداء)আদা তথা ছাত্রদের কাছে হাদীস বর্ণনা করা।

সাধারণত কোন মুহাদ্দিস যখন হাদীস বর্ণনা করাকেই দিন-রাতের ব্যস্ততা বানিয়ে নেন তখন তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পক্ষান্তরে হাদীস বর্ণনা করা যদি কারো ব্যস্ততা বা কর্মের ময়দান না হয় তাহলে স্বভাবতই মুহাদ্দিস হিসেবে তার খ্যাতি ছড়ায় না।

কিন্তু হাদীস বর্ণনা করা বা না করাকে হাদীস জানার একমাত্র মানদন্ড বানানো কখনোই বাস্তব সম্মত নয়।

সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর রা.এর কথাই ধরুন। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মূহুর্তের সঙ্গী ছিলেন।তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা খুবই কম (১৪২টি)।অথচ সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ছিলেন সবচাইতে জ্ঞানী সাহাবী। তাঁর রেওয়ায়াতকে মানদন্ড বানালে মহাজ্ঞানী তো দূরের কথা সাধারণ আলেম সাহাবী মানাই তো কষ্টকর হয়ে যাবে!

হযরত উমর রা.আলী রা.এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তো আসলে তাঁরা কম জানতেন এমন নয়, বরং এটাকে তাঁরা খেদমতের ময়দান বানাননি।

একই কথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী,ইমাম মালেক রহ.এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিশিষ্ট শাফেয়ী মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস সালেহী রহ."উকুদুল জুমান"কিতাবে বলেন,আবু হানিফা রহ.বিশিষ্ট হাফিযুল হাদীস ছিলেন। হাদীসের প্রতি যত্ন না থাকলে তাঁর পক্ষে ইজতিহাদ করা সম্ভব হত না।"

অন্যত্র বলেন,ইজতিহাদের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তাঁর থেকে হাদীসের বর্ণনা কম পাওয়া যায়। যদিও তিনি হাফীযুল হাদীস ছিলেন।একই কারণে ইমাম শাফেয়ী,মালেক রহ-এর বর্ণনা সংখ্যাও কম।"

২.

উলুমুল হাদিসে ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ.একটি জনপ্রিয় ও বাস্তবসম্মত উক্তি চালু আছে"إذا جمعت فقمش وإذا رويت ففتش"তথা যখন হাদীস সংগ্রহ করবে তখন যত পারো সংগ্রহ করো।আর যখন বর্ণনা করবে তখন বেছে বেছে বর্ণনা করো।"

মুহাদ্দিসীনে কেরামের জীবনী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকলে যে কেউ এবিষয়টি বুঝতে পারবে।

ইমাম মালেক রহ.বলেছেন,"আমি নিজ হাতে এক লক্ষ হাদীস লিখেছি"।অথচ মুয়াত্বা খুলে দেখুন মাত্র ৬০০ মারফু হাদীস আছে সেখানে।

প্রসিদ্ধ আছে,ইমাম আহমাদ রহ. সাড়ে সাত লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে তাঁর "মুসনাদ"সংকলন করেছেন।যেখানে হাদীস রয়েছে সবমিলিয়ে ৩০হাজারের মত।(২৭৬৪৭)

ইমাম বুখারী রহ.ছয়লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে"সহীহ"সংকলন করেছেন যেখানে হাদীস রয়েছে ৭২৭৫।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম,যাঁরা হাদীস চর্চাকেই নিজেদের খেদমতের মাধ্যম বানিয়েছেন তাঁরাও নিজেদের সংগ্রহের সব হাদীসই বর্ণনা করতেন না। তাঁরা কেবল সেসকল হাদীসই সংকলন করেছেন যেগুলো তাঁদের শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আর হাদীস বর্ণনার জন্য ইমাম আবু হানিফা রহ.এর শর্ত ছিল সবচেয়ে কঠিন।সেটা হল, হাদীসটি বর্ণনাকারী যখন সংগ্রহ করেছেন তখন থেকে আরেকজনের কাছে বর্ণনা করা পর্যন্ত মাঝের পূর্ণ সময় মুখস্থ থাকা।

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম হবার এটাও একটি বড় কারণ।

৩.

ইমাম আবু দাউদ রহ.বলেন,আল্লাহ আবু হানিফার উপর রহমত বর্ষণ করুন,তিনি ইমাম ছিলেন"।(জামিউ বয়ানিল ইলম)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ."মিনহাজুস সুন্নাহ"তে আবু হানিফা রহ কে একজন প্রসিদ্ধ ইমাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং পুরো উম্মত যখন তাঁকে মুজতাহিদ ইমাম হিসেবে বরণ করে নিয়েছে তখন আসলে এধরনের প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না।কারণ বিপুল পরিমাণ হাদীস আয়ত্বে না থাকলে মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব নয়।

ইমাম আহমাদ রহ.কে একব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,কেউ যদি একলক্ষ হাদীস মুখস্থ করে সে কি মুজতাহিদ হতে পারবে?তিনি বললেন,না।সে বলল,দুইলক্ষ মুখস্থ করলে? বললেন,না।সে বলল,তিনলক্ষ মুখস্থ করলে? বললেন,না।সে বলল,তাহলে চারলক্ষ মুখস্থ করলে?তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বোঝালেন,হ্যাঁ,তাহলে সে ইজতিহাদের উপযুক্ত হতে পারে।(আসারুল হাদীসীশ শরীফ,১৭১-১৮৭)

১৩) মুজতাহিদ হওয়ার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।

বড়ভাই শায়খ, ছোট ভাই তাঁর কাছে ইলম শিক্ষা করতে যায়।রাস্তায় আরেকজন শায়খের সাথে দেখা।যার সাথে আবার বড় ভাইয়ের প্রায়ই বাহাস হয়।

ছোটভাইকে পড়তে যেতে দেখে শায়খ বললেন,কই যাও?

ছোট ভাই: পড়তে যাচ্ছি।

শায়খ:কী পড়?

ছোট ভাই:এই তো,নানা বিষয়ই পড়া হয়।

শায়খ:আমি কি তোমাকে একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি শিখিয়ে দিব? তাহলে তুমি অল্প সময়েই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করবে।

ছোট ভাই: তাই নাকি? কতদিন লাগতে পারে?

শায়খ: এই ধরো এক মাস।

ছোট ভাই: বাহ!গুড আইডিয়া।

শায়খ: আরো অল্প সময়ে এক সপ্তাহেও সম্ভব।

ছোট ভাই: তাহলে তো আরো ভালো।

শায়খ: বুঝলে আরো কম সময়ে সম্ভব।

ছোট ভাই: তাই নাকি?তাহলে তো কথাই নেই।কী সেই পদ্ধতি?

শায়খ: যখন তুমি কোন মাসআলার সম্মুখীন হবে তখন সেটার সমাধান প্রথমে কুরআনে খোঁজ।যদি পেয়ে যাও তাহলে তো ভালো।

নাহলে হাদীসে খোঁজ কর।যদি পেয়ে যাও তাহলে তো আর কথা নাই।

আর না পেলে ইজমাতে খোঁজ কর। সেখানেও না পেলে সেক্ষেত্রে মুলনীতি হলো,সেই কাজটি বৈধ(যেহেতু কোন নিষেধাজ্ঞা নেই)তা করতে পারো।

ছোট ভাই: শায়খ! আপনি আমাকে যে পদ্ধতির কথা বললেন সেটা বাস্তবায়নের জন্য তো দীর্ঘ জীবন ও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন।

কেননা সেক্ষেত্রে প্রথমত কুরআনকে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে।এর নাসিখ-মানসুখ(রহিত ও রহিতকারী আয়াত), অকাট্য ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ আয়াত,ব্যাপক ও নি:শর্ত আয়াত সমূহসহ উলুমুল কুরআনের যাবতীয় অধ্যায়ে পারদর্শী হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বিপুল পরিমাণ হাদীস মুখস্থ থাকতে হবে।সহীহ-যয়ীফ,মারফু-মাওকুফ,মুসনাদ,মুরসাল, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি নানা শ্রেণীর হাদীসনির্ণয়ের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

রাবী বা বর্ণনাকারীদের জীবনী ও যোগ্যতা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে।

হাদীস সংকলনের ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপগুলো জানতে হবে।

মোটকথা উলুমুল হাদিসের শতাধিক শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করতে হবে।

তৃতীয়ত :ইজমায়ের মাসআলাগুলো জানতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে যে মাসআলাগুলোতে ইজমা হয়েছে সেগুলো নিশ্চিত হতে হবে।

এখন আপনিই বলুন একজনের পক্ষে কি এতকিছু আয়ত্ব করা সম্ভব?

(আসারুল হাদীসীশ শরীফ অবলম্বনে)

১৪) ফিকহুল হানাফী নাকি ফিকহুস সুন্নাহ,কোনটা অনুসরণ করব?

এই প্রশ্নটা আজকাল কিছু ভাইয়ের মুখে খুব শোনা যায়।কেউ কেউ তো আরো আগে বেড়ে বলেন, আপনারা কার সালাত পড়তে চান,আবু হানিফার সালাত নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত?(معاذ الله)

সঙ্গত কারণেই একজন সাধারণ মুসুল্লীর জন্য প্রশ্নটা খুব বিব্রতকর।

আজকে আমরা এই বিষয়টি খোলাসা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১.

তাদের কথার সারমর্ম হলো, মাযহাবের যে ফিকহ ও মাসআলা-মাসায়িল সেগুলো হলো ইমামদের ফিকহ।যেমন শাফেয়ী মাযহাবে ইমাম শাফেয়ীর ফিকহ,হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু হানিফার ফিকহ। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তাইলে কুরআন ও হাদীসের ফিকহ কোনটা?এর উত্তরে তারা বলে,কুরআন-হাদীস খুলুন সেখান থেকে যেটা বোঝা যায় সেটাই হলো ফিকহুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ। এই নামে তারা কিতাবও রচনা করেছে।

তো বাহ্যিকভাবে তাদের এই কথাটা খুব চমৎকার,যে আমরা ইমামদের ফিকহ মানিনা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকহ অনুসরণ করি। কিন্তু আসলে তাঁদের কথায় বড়ধরনের ঘাপলা আছে।

এখন আসুন আগে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি "ফিকহুল হানাফী"বা"ইমামদের ফিকহ" এই কথার অর্থ কী?

২.

ইমামগণ কুরআন হাদীস থেকে মাসআলা বের করার জন্য সারাজীবন গবেষণা করে গেছেন। তাঁদের যোগ্যতা ও ইলমের জন্য তাঁদের আত্মনিবেদন অতুলনীয়।তো কুরআন-হাদীস থেকে তাঁরা যা বুঝেছেন সেটাই তাঁদের ফিকহ আকারে সংকলিত হয়েছে।সহজ ভাষায়"কুরআন-হাদীস থেকে তাঁরা যেটা বুঝেছেন তাঁদের সেই বুঝলদ্ধ জ্ঞানই হলো তাঁদের "ফিকহ"।

তাহলে আমরা চৌদ্দশত বছর পর কুরআন-হাদীস খুলে যেটা বুঝলাম সেটা "ফিকহুস সুন্নাহ" হলো আর ইমামগণ (কেউ তাবেয়ী কেউ তাবে তাবেয়ী) কুরআন-হাদীস থেকে যেটা বুঝলেন সেটা "ফিকহুস সুন্নাহ" না হয়ে "ইমামদের ফিকহ" হলো এ কেমন বিচার?!(فمالكم كيف تحكمون)

আসল কথা হলো,ফিকহে হানাফী,ফিকহে শাফেয়ী মানে কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম শাফেয়ী রহ.এর বুঝ।

আর তারা যেটা "ফিকহুস সুন্নাহ"বলছে সেটা আলাদা কিছু নয়, বরং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে তাদের নিজেদের বুঝটাকেই "ফিকহুস সুন্নাহ"বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

৩.

তাই এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, কুরআন-হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের বুঝ উত্তম নাকি ইমামদের বুঝ?

তাহলেই পাশার দান উল্টে যাবে।কারণ কোন সচেতন মুসলমানই ইমামগণের বুঝ রেখে তাদের বুঝ গ্রহন করতে যাবে না।

নিজেদের মতামতকে সাধারণ মুসলমানদের উপর চাপানোর জন্যই এই ধরনের শব্দের মারপ্যাঁচের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে।(আসতাগফিরুল্লাহ)

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

১৫) চারমাযহাবকে এক করে দিলে কি সমস্যা?

এ প্রসঙ্গে আরব বিশ্বের বিশিষ্ট গবেষক আলেমেদ্বীন শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফি:এর একটা ঘটনা শোনাই।

১৩৯০হিজরী সনের কথা। তাঁর এক ছাত্র প্রশ্ন করল,সবগুলো মাযহাবকে এক করে মানুষকে একই মাযহাবের অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা-প্রচেষ্টা আপনার দৃষ্টিতে কেমন?

শায়খ:এই ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাশরী"(শরীয়ত প্রণয়ন)এর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার চাওয়ার বিরোধী। পাশাপাশি রাসুল (সা:) , সাহাবায়ে কেরাম,সালাফে সালেহীনেরও খেলাফ। এবং (কমন সেন্স)সাধারণ বিবেচনাবোধেরও বিপরীত।

এরপর শায়খ খুলে বললেন, আল্লাহ তায়ালা কি আদিকাল থেকেই জানতেন না যে,আরবরা قرء শব্দটা হায়েজ ও পবিত্রতা এই দুই অর্থেই ব্যবহার করে?

ছাত্র: নিশ্চয়ই জানতেন।

শায়খ: আল্লাহ তায়ালা কি আদিকাল থেকেই জানতেন না,যায়দ বিন সাবিত ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ নামে দুজন সাহাবী থাকবেন।

যায়েদ বলবেন,قرء অর্থ পবিত্রতা।আর ইবনে মাসউদ তাঁর সাথে দ্বিমত করে বলবেন قرءঅর্থ হায়েয?

ছাত্র: নিশ্চয়ই জানতেন।

শায়খ: তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বানী ثلاثة قروء কে এমন সুনির্দিষ্ট করে কেন নাযিল করলেন না যেখানে ইবনে মাসউদ ও যায়েদ রা:এর ইখতেলাফের কোন সুযোগই থাকত না?

(একই কথা কুরআন মাজিদের ঐ সমস্ত নুসুসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে অর্থ নির্ণয়ে একাধিক মতের সৃষ্টি হয়েছে।)

হাদীস শরীফের ক্ষেত্রেও একই কথা।আমরা বিশ্বাস করি হাদীস শরীফও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী স্বরূপ।

তাহলে আল্লাহ তায়ালা নবীজীকে কেন এ মর্মে নির্দেশ দিলেন না,যে তিনি তাঁর হাদীসগুলো এমন শব্দে বলেন যেন ইখতেলাফের সুযোগই না থাকে?

যেদিন তিনি সাহাবীদের বনী কুরাইজায় দ্রুত যেতে বলেছিলেন সেদিন "তোমরা বনী কুরাইজার রাস্তায় আসর পড়বে না"এমন কেন বললেন না?

বরং এভাবে বললেন,বনূ কুরাইযায় না পৌছে কেউ'যেন আসরের সালাত আদায় না করে।(তাদের একাংশের পথিমধ্যে আসরের সলাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার আগে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় করব, সময় হলেও রাস্তায় সালাত আদায় করা যাবে না উদ্দেশ্য তা নয়। বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেননি।(৪১১৯,সহীহ বুখারী)

এরপর শায়খ বললেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তীরা কি ইখতেলাফ করেননি?

ছাত্র: করেছেন।

শায়খ: মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কি মুখতালিফ বা বৈচিত্র্যময় নয়?

ছাত্র:জ্বী।

শায়খ: এই ইখতেলাফ বা বৈচিত্র্য কি এই জন্য নয় যে মানুষের জীবন ও সমাজ বৈচিত্র্যের উপাদানে ভরপুর?

ছাত্র: জ্বী,আলবত,জীবন ও সমাজের বৈচিত্রের কারণেই মানুষের মাঝে বৈচিত্র্যের জন্ম।

শায়খ: তাহলে সব মাযহাবকে একত্রীকরণ ও সব মানুষকে একই মাযহাবের অধীনে আনার চেষ্টা হয় পাগলামী না হয় গোমরাহী;এছাড়া আর কিছুই নয়!

(আদাবুল ইখতেলাফ,২৬-২৭)

১৬) আল্লাহ এক,রাসুল(সা:)এক,মাযহাব চারটা কেন?

১.

মূল উত্তরে যাবার আগে একটি উদাহরণ দেখুন। রাশেদরা চার ভাই। রাশেদ,আহনাফ,সাদ,ইকবাল। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে বাবা এক,মা এক,ভাই চারটা কেন? তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে বলুন?

বাবা-মা তো একজনই হবেন, এখানে একাধিক হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।আর ভাই-বোন চার কেন,চল্লিশ হলেও কোন সমস্যা নেই।এটাই স্বাভাবিক।

তারমানে পৃথিবীতে কিছু জিনিস একটাই হয়,এর বেশি হবার সুযোগই নেই।আর কিছু জিনিস একাধিক হতে পারে তাতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই।

বরং এই উভয় প্রকারের মধ্যে তালগোল পাকানোটাই অষ্টমাশ্চার্যের ব্যাপার।

২.

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি।

তাওহীদ,রিসালাত এগুলো মৌলিক ঈমানের অংশ। এগুলোতে কোন অংশীদারিত্ব চলে না।

আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ-বলুন ‘তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়।(সুরা ইখলাস,১)

ইলাহের মাঝে কোন অংশীদারিত্ব সম্ভব নয়।আল্লাহ বলেন,"যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হত(সুরা আম্বিয়া,২২)

রিসালাতের মধ্যেও কোন অংশীদারিত্ব চলে না।আল্লাহ তায়ালা বলেন,"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না"।(সুরা আলে ইমরান,৮৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যদি মুসা(আ:)জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না"।(মুসনাদে আহমাদ,১৫১৫৬)

তো "আল্লাহ এক, রাসুল (সা:) এক" এটা নিয়ে কারো ইখতেলাফ/দ্বিমত কিছুই নেই।আর এটা দ্বিমত করার মত বিষয়ই নয়।

পক্ষান্তরে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েল(চাই আকীদার ক্ষেত্রে বা আহকামের ক্ষেত্রে) সেখানে ইখতেলাফ হতে পারে এবং সেটা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রাসুলের যুগেই হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটার অনুমোদনও দিয়েছেন।

নবীজি (সা:) বলেছিলেন,"বনূ কুরাইযায় না পৌছে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে"।(তাদের একাংশের পথিমধ্যে আসরের সলাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌছার আগে সালাত আদায় করব না।

আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় করব, সময় হলেও রাস্তায় সালাত আদায় করা যাবে না উদ্দেশ্য তা নয়। বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতি অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেননি।(৪১১৯,সহীহ বুখারী)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.মাজমুয়ুল ফাতাওয়াতে এই হাদীসকে শাখাগত মাসআলায় ইখতেলাফ হবার উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন।

৩.

প্রিয় ভাই!

বাবা-মা এক হয়ে ভাই-বোন একাধিক হওয়া যেমন অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয়। ঠিক তেমনি আল্লাহ এক,রাসুল(সা:) এক হয়ে মাযহাব একাধিক হওয়াটাও অযৌক্তিক নয়।

বরং তাওহীদ,রিসালাতের মতো অকাট্য ও মৌলিক, অবিভাজ্য বিষয়কে শাখাগত মাসআলার সাথে মিলিয়ে প্রশ্ন করাটাই অযৌক্তিক ও অবান্তর।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বোঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

১৭) সহীহ বুখারীর অনুসরণ মূলত ইমাম বুখারীর ফিকহী মাযহাবেরই অনুসরণ।

অনেক ভাই এটা ভাবেন যে,আমরা শুধু কুরআন আর হাদীস অনুসরণ করব।এর বাইরে মাযহাব তথা ফুকাহায়ে কেরামের মত অনুসরণের দরকার নেই।

তো পূর্বের কোন এক পোস্টে আমরা এবিষয়টি স্পষ্ট করেছিলাম যে ফিকহী মতগুলো মূলত হাদীসেরই ব্যাখ্যা, ভিন্ন কিছু নয়।(যেমনটি ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.বলেছেন)তাই যারা ফিকহি মাযহাব অনুসরণ করেন তারা হাদীসেরই অনুসরণ করেন।

আজ আমরা দেখব,যারা শুধু হাদীসের অনুসরণ করেন বলে দাবী করেন তারাও কোন না কোন ফিকহী মাযহাবেরই অনুসরণ করেন।

আচ্ছা বলুন! হাদীস আপনি কোত্থেকে নিবেন?প্রথমেই আসবে সহীহ বুখারীর নাম, এরপর সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য।

এখন তাঁরা তো তাঁদের কিতাবে সমস্ত সহীহ হাদীস জমা করেননি,এর বাইরে আরো প্রচুর হাদীস বরং সহীহ হাদীসও রয়ে গেছে।

এর অর্থ যে হাদীসগুলোকে তাঁরা আমল উপযোগী মনে করেছেন এবং যেগুলো তাঁদের ফিকহী মাযহাবের দলীল সেই হাদীসগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে কিতাবে উল্লেখ করেছেন।আবার অনেক সময় অন্য মতের হাদীসগুলোও এনেছেন,তবে সেগুলোর উপর নিজমতের হাদীসগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাই সেই হাদীসের কিতাব থেকে অনুসরণ মানে তাঁদের ফিকহী মাযহাবেরই অনুসরণ।

একথাটিই আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.বলেছেন,سري فقههم الى حديثهم তথা তাঁদের ফিকহী মাযহাব তাঁদের হাদীস সংকলনকে প্রভাবিত করেছে"।

একথার চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর একান্ত শাগরিদ আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ.।

তিনি তিরমীযী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মাআরিফুস সুনানে"বলেন,"ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মত বড় বড় মুহাদ্দিসীনগণের ইজতিহাদী ও ফিকহি মতামত রয়েছে।

ইখতেলাফী মাসআলায় তাঁরা তাঁদের ইমামদের অনুসরণে বা নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে একটি মতকে প্রাধান্য দিতেন বা আমলের জন্য গ্রহণ করতেন।

এরপর যখন তাঁরা হাদীস সংকলন করলেন তখন সেখানে নিজেদের পক্ষের হাদীসগুলোই কেবল উল্লেখ করার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিলেন,এর বাইরেরগুলো আনলেন না (আবার অনেক জায়গায় এনেছেন কিন্তু পরে সেগুলো রদ করেছেন)যেহেতু সেগুলো তাঁরা গ্রহণ করেননি।এভাবেই তাঁদের ফিকহি মত তাঁদের হাদীস সংকলনকে প্রভাবিত করেছিল।

তবে অনেক মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁদের কিতাবগুলোতে উভয় পক্ষের হাদীসগুলোই সংকলনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।যেমন ইমাম তিরমিযী,ইমাম ইবনে আবি শাইবা,ইমাম আব্দুর রাজ্জাক,ইমাম আহমাদ রহ.।"

১.

হাদীসের কিতাবে কেবল নিজপক্ষের হাদীস আনার উদাহরণঃ

জানাযা দেখলে দাঁড়াবে কিনা?

এই মাসআলার পক্ষে-বিপক্ষ উভয়দিকের হাদীসগুলো ইমাম মুসলিম,ইমাম নাসায়ী নিজ নিজ গ্রন্থে এনেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.শুধু দাঁড়ানোর পক্ষের হাদীসগুলো এনেছেন।কারণ এটাই তাঁর মাযহাব ছিল।

২.

আবার অনেক সময় ইমামগণ উভয় পক্ষের হাদীস এনে নিজমতের হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন।

উদাহরণ:

ইমাম মুসলিম জানাযার জন্য দাঁড়ানোর পক্ষের হাদীসগুলোকে মানসুখ আর বিপক্ষের হাদীসগুলোকে নাসিখ মনে করতেন,তাই সেগুলোকে অধ্যায়ের শেষে এনেছেন।আর ইমাম মুসলিমের নিয়ম হল যে হাদীসগুলো তাঁর নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও যেগুলো থেকে ফিকহি মত গ্রহন করেন সেগুলো অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করেন।"(যেমনটি ইমাম কুরতুবী রহ.বলেছেন)।

ইমাম নাসায়ী ও ইমাম আবু দাউদ রহ.ও এমনটি করেন।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে,সহীহ বুখারী,সহীহ মুসলিম ইত্যাদি হাদীসের কিতাব দেখে আমল করার অর্থ হলো ঐ কিতাবের সংকলকের ফিকহী মাযহাবই অনুসরণ করা।

কাজেই ফলাফল দাঁড়াল,কেউ আবু হানিফা,শাফেয়ী,মালেক রহ.প্রমুখ ফকীহগণের এর মাযহাব অনুসরণ করে।আর কেউ বুখারী, মুসলিম,নাসায়ী রহ.প্রমুখ মুহাদ্দিসীনদের মাযহাব অনুসরণ করে। মাযহাবের বাইরে কেউ নেই।

সুতরাং যারা বলে আমরা কোন মাযহাব মানিনা তারা আসলে প্রকৃত বিষয়টি না বুঝেই শেখানো বুলি মুখস্থ আওড়ে যান।

১৮) দলীল পর্যালোচনার প্রাথমিক মূলনীতি।

(আজকে উসুলুল ফিকহের একটি প্রাথমিক মূলনীতি আলোচনা করব।দলীল পর্যালোচনা যদিও আহলে ইলমের কাজ, কিন্তু এখন যেহেতু আওয়ামের সামনেও

দলীল পেশ করা হয় তাই এই মূলনীতিটি কিছুটা বুঝলেও তাদের মনে অন্তত খটকা জাগবে।ফলে দলীল শুনেই ধোঁকায় পড়বে না ইনশাআল্লাহ।)

যেকোনো ভুল মতের অসারতা প্রমাণ করা যায় দুইভাবে।

১.সেটার দলীলের বিপরীতে শক্তিশালী দলীল দিয়ে।২.সেটার ইসতেদলাল তথা দলীলগ্রহন পদ্ধতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলার মাধ্যমে।

আজকের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় পদ্ধতি।

১.

শরীয়তের উৎস তথা কুরআন ও হাদীসের সমস্ত নুসুস প্রামাণ্যতার বিবেচনায় দুই প্রকার।

১.قطعي الثبوت তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। যেমন-কুরআনের আয়াত,হাদীসে মুতাওয়াতির।

২.ظني الثبوت তথা প্রবলধারণার ভিত্তিতে প্রমাণিত।যেমন-সহীহ হাদীস।(সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাগণের মতে)

এরপর এই উভয় প্রকার নুসুস"দালালাত"তথা অর্থ প্রদানের বিবেচনায় আবার দুই প্রকার।

১.قطعي الدلالة তথা দ্ব্যর্থহীন নস।যেটির দ্বিতীয় কোন অর্থ হতে পারে না।যেমন আল্লাহর বাণী-বলুন 'তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়।"এই আয়াত অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং এর অর্থও নির্দিষ্ট, দ্বিতীয় কোন অর্থ বোঝার কোন সুযোগ এখানে নেই।

২.ظني الدلالة তথা দ্ব্যর্থবোধক তথা যেটির একাধিক অর্থ হতে পারে।যেমন-

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহযাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ শেষে) বললেন, বনূ কুরাইযায় না পৌছে কেউ 'আসরের সালাত আদায় করবে না।" (সহিহ বুখারী, ৪১১৯)

এই হাদীসটি সাহাবায়ে কেরাম শুনে দুই দল দুইরকম অর্থ বুঝেছিলেন।একদল সময়মত আসর পড়েছেন আরেকদল বনু কুরাইযায় গিয়ে আদায় করেছেন।আর নবীজীও বিষয়টি বহাল রেখেছেন,নাকচ করেননি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, যেকোনো দলিল এর দুটি দিক। একটি হলো অকাট্যভাবে সেটি প্রমাণিত হওয়া। আরেকটি হল সেটির অর্থটি সুনিশ্চিত ভাবে নির্ধারিত থাকা।

কোন মাসালা তখনই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যখন তার দলিলের উভয়দিক قطعي বা অকাট্য হবে। আর যদি কোন একটি দিক ظني বা সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তাহলে সেটি আর অকাট্য থাকে না, বিশেষত দালালাতের ক্ষেত্রে হলে সেখানে ইজতিহাদ করে যেকোনো একটি অর্থ গ্রহনের সুযোগ থাকে।

২.

প্রথম উদাহরণ:

যারা আটরাকাত তারাবীর কথা বলেন তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হল আয়েশা রা.এর এগার রাকাত সম্বলিত হাদীস।এটি প্রামাণ্যতার বিচারে ظني الثبوت তথা প্রবলধারণার ভিত্তিতে প্রমাণিত, অকাট্য নয়,আবার দাবীর পক্ষে এর দালালাতও দূর্বল।কেননা এটি তারাবীর ক্ষেত্রে হবার মতের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে হবারও শক্তিশালী মত রয়েছে।

মুজতাহিদ ফুকাহায়গণ তো বটেই মুহাদ্দিসগণও এই হাদীসকে তারাবীর ক্ষেত্রে নয়, তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রেই মনে করতেন। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম মালেক, আব্দুর রাযযাক, দারিমী, আবূ আওয়ানা ও ইবনে খুযায়মা র. প্রমুখ সকলেই এই হাদীসকে তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন; তারাবী বা কিয়ামে রামাযান অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শুধু ইমাম বুখারী র. এ হাদীস তারাবী ও তাহাজ্জুদ উভয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর নীতি সকলের জানা। তিনি সামান্য সম্পর্কের কারণেই হাদীস পুনরুল্লেখ করেন। তিনি একথাও বুঝিয়ে থাকতে পারেন, রমযানে তারাবী পড়া হলেও শেষে তাহাজ্জুদও পড়ে নেয়া উচিৎ । বুখারী র. নিজেও তারাবী পড়ে শেষরাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। (ফাতহুল বারীর মুকাদ্দিমা সূত্রে দলীলসহ নামাজের মাসায়েল)

এবার দেখুন হাদীসটি নিজ অর্থ বোঝানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আর অকাট্য রইল না, বরং এর একাধিক অর্থ পাওয়া গেল ১.তারাবী,২.তাহাজ্জুদ। আবার তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে হবার মতটিই অধিকাংশ ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের মত।

তাহলে বলুন এরকম দলীলের উপর ভিত্তি করে কি আট রাকাতের অকাট্য সিদ্ধান্ত দেয়া যায়?ভিন্নমতকে বাতিল বলা যায়?

৩.দ্বিতীয় উদাহরণ:

এক বক্তা"পীরসাহেব মুরিদদের জান্নাতে নিতে পারবেন" বলে দাবী করেছেন।দলীল হল শাফায়াত সংক্রান্ত সহীহ হাদীস।(এই মতের বিরুদ্ধে অনেক নুসুস আছে, কিন্তু আমরা দেখব যে আসলে এই হাদীস দিয়ে দলীল দেয়াটাই ভুল।)

হাদীসে যে শাফায়াতের কথা বলা হয়েছে সেটা তো মুমিনদের জান্নাত নিশ্চিত হওয়া ও অন্যদের জাহান্নামের ফয়সালা হবার পর।তারা যেভাবে নিশ্চিতভাবে বলে সেটা তো কারো ব্যাপারেই প্রমাণিত না নবী রসূল ছাড়া।

কারণ ওই পীরসাহেব নিজে মুক্তি পাবে কিনা, সেই নিশ্চয়তা দিলো কে? তারপর যদি মুক্তি পায়ও, তারপর আবার সে সুপারিশের অনুমতি পাবে, সেটাও অনিশ্চিত। কারণ সুপারিশ তো কেবল তারাই করতে পারবে, যাদেরকে আল্লাহ অনুমতি দিবেন।(আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।(সুরা সাবা,২৩)

তাই একথা সুস্পষ্ট যে,দলীল তাদের দাবীকে)ظني/ قطعيদ্ব্যর্থহীন বা দ্ব্যর্থবোধক) কোন ভাবেই বোঝাচ্ছে না।দাবী ও দলীলের মাঝে বিস্তর ফারাক। এখন সে যত শক্তিশালী দলীলই পেশ করুক না কেন দাবীর সাথে না মিললে সেই দলীল উপস্থাপন অর্থহীন, ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্তিকর।

৪.

দলিল বোঝার এই প্রাথমিক মূলনীতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ধরা পড়ার আশংকায় আজকাল কেউ আর সরাসরি আয়াত-হাদীসের মধ্যে তাহরীফ বা পরিবর্তন করে না । বরং এখন তাহরীফ হয় ব্যাখ্যার মধ্যে।সমাজে ভালো-মন্দ সব ফিরকাই কোরআন-হাদিস থেকে দলিল দেয়। এখন কোরআন-হাদিস তো সত্য কিন্তু তাই বলে কি সবার দাবীই সত্য?

যদি সত্য না হয় তাহলে তাদের সমস্যাটা আসলে কোন জায়গায়?এর উত্তর হলো আসল সমস্যা ইসতেদলাল তথা দাবীর সাথে দলীলের সম্পর্কের জায়গায়। অর্থাৎ তারা যেটা দাবী করে দলীল থেকে সেটা বোঝা যায় না।দলীলের উপর তারা নিজেদের দাবী চাপিয়ে দেয়।

১৯) যেমন ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দ-১

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা বা বলেন,আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন যদি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলতে হয় তাহলে বলতে হবে, তারা ইসলামের সোনালী যুগের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সালাফে সালেহীনের নমুনা ছিলেন, ইসলামী মেজাজ ও রুচির মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

আর বিস্তারিত বলতে গেলে সত্য কথা হলো পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা যাবে কিন্তু তাতেও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে আনা সম্ভব নয়। কারণ মেজাজ রুচি ও স্বভাবের বিষয়টি এমন যে তাকে কখনো ভাষায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ গোলাপের সুবাসের কথা যেভাবে বলা হোক না কেন কোনভাবেই তার পূর্ণ ভাব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। গোলাপের ঘ্রাণ সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য ঘ্রাণ নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

তেমনি তাঁদের মেজায সঠিক ভাবে উপলব্ধির জন্য তাঁদের সাহচর্য ও তাঁদের ঘটনাগুলো জানা ছাড়া কোন উপায় নেই।

তাই দালিলিক আলোচনায় না গিয়ে আকাবিরে দেওবন্দের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই যার মাধ্যমে তাদের উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যাবে।

যদি বিপুল অধ্যয়ন ও তুখোড় মেধার কথা বলা হয় তাহলে এর উদাহরণ এখনো অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু আকাবিরে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্যের জায়গাটি ছিল তারা বিস্তৃত অধ্যয়ন, গভীর জ্ঞান ও তুখোড় মেধাবী হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত বিনয়ী ও মুখলিস ছিলেন।

একটি খুব প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, যে ডালে ফল থাকে সেই ডাল ঝুঁকে থাকে, আকাবিরে দেওবন্দ এই প্রবাদের উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা,হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী রহমতুল্লাহি আলাইহি কিছু ঘটনা আলোচনা করা যাক।

আল্লামা কাসেম নানুতবী রহমতুল্লাহি আলাইহি ইলমের অথৈ সাগর ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ আবেহায়াত,

তাকরিরে দিলপজির,কাসেমুল উলুম আওর মুবাহাসায়ে শাহজাহানপুর ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ হয়।

তার কিছু কিছু কিতাব তো এত জটিল যে,অনেক ভালো ভালো আলমের পক্ষেও সেগুলো বুঝতে কষ্ট হয়ে যায়।এমনকি মাওলানা কাসেম নানুতবীর সমকালীন বুযুর্গ মাওলানা ইয়াকুব নানুতবীর একটি বক্তব্য দারুল উলুম দেওবন্দে খুব প্রসিদ্ধ ছিল যে আবেহায়াত কিতাবটি আমি ছয়বার পড়ার পর এখন কিছু কিছু বুঝতে শুরু করেছি।

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর রহমতুল্লাহি বলেন, কাসেম নানুতবী রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর লেখনী আমার বুঝে আসেনা।আবার খুব যে চেষ্টা মেহনত করব সেই ধৈর্য হয়না। এর জন্য সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারি না। তবে মনকে প্রবোধ দেই যে, দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহজ সহজ কিতাব থেকে বুঝে নিলেই তো হয়, এত কষ্ট করার দরকার কি?

একদিকে এত গভীর দ্বীনি ইলমের অধিকারী অন্যদিকে তিনি মানতেক বা যুক্তিশাস্ত্রের বড় বিশেষজ্ঞ হবার পরও তিনি এত বিনয়ী ছিলেন যে,

মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী বলেন,যেই ছাত্রের মাঝে নানুতবী রহমতুল্লাহি আলাইহি অহংকারের ছিটেফোঁটাও দেখতেন তাদেরকে দিয়ে তিনি জুতা উঠাতেন।আর যাদের মাঝে বিনয় দেখতে পেতেন তাদের জুতা তিনি নিজ হাতে তুলে নিতেন।"

(আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থেঁ,১-২)

যেমন ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দ। পর্ব-২

হযরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব রহ.। দারুল উলুমে তিনি মিয়া সাহেব নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। আজন্ম বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। ছোটবেলাতেও কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। বাচ্চারা অনেক রকম হইচই-শোরগোল,দুষ্টামি করলেও তিনি সব সময় এসব থেকে দূরে থাকতেন। কোন ভুল হয়ে গেলে স্পষ্ট ভাষায় ভুল স্বীকার করে নিতেন।

দারুল উলুম দেওবন্দে তিনি উঁচুমানের মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর কাছে "সুনানে আবু দাউদ"এর পাঠ গ্রহণ করেছে এমন শত শত আলেম পুরো ভারতবর্ষজুড়ে ছড়িয়ে আছেন।

হাদীস,ফিকহ মানতেক,ফালসাফা অর্থাৎ ইলমের গুরুত্বপূর্ণ অনেক শাখায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। অত্যন্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। ক্লাসে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতেন কিন্তু সেটি এতটাই পূর্ণাঙ্গ হতো যে হাদীসের ভাষ্য পুরোপুরি বুঝা যেত এবং অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যেত।

ইলমের দরিয়া হওয়া সত্ত্বেও খুবই সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন।

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা:বা: লিখেন, একদিন বাদ মাগরিব আব্বাজান (মুফতি মোহাম্মদ শফী রহ.) ও আমার বড় ভাই যাকী কাইফী হযরত এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন, আম খাবেন? আব্বাজান বললেন, আম! তাও আবার হযরত ওস্তাদের দেওয়া! অবশ্যই খেতে হবে।

মিয়া সাহেব উঠে ভিতরে গেলেন এবং একজোড়া মেনে তাদের সামনে রাখলেন। আমের ছোলা ও আঁটি রাখার জন্য আলাদা পাত্র দিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আব্বাজান আঁটি ও ছোলা ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়ার জন্য উঠলেন।

হযরত বললেন ঝুড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

আব্বাজান বললেন আঁটি ও ছোলা ফেলে দিয়ে আসি। হযরত বললেন ফেলতে পারবে তো?

আব্বাজান বললেন এটা আবার এমন কি কাজ? হযরত বললেন তোমরা এই বিষয়টা জানো না আমাকে দাও।

হযরত ঝুড়ি নিয়ে প্রথমে আঁটি ও ছোলা আলাদা করলেন।এরপর ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশে একটু দূরে দূরে ছোলাগুলো ফেললেন এবং একটি বিশেষ জায়গায় আঁটিগুলো রেখে দিলেন।

এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে হযরত বললেন, আমাদের বাড়ির আশেপাশে প্রায় সকলেই গরিব মিসকিন। অধিকাংশ তো এমন যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়।ফলের এতগুলো ছোলা ও আঁটি এক জায়গায় দেখে তাদের দারিদ্র্যের অনুভূতি তীব্র হতে পারে। এজন্য খোসাগুলো পশুর চারণভূমিতে ছড়িয়ে দিয়েছি, গরু ছাগল এসে এসব খেয়ে নিবে।

আর আঁটিগুলো এমন স্থানে রেখেছি যেখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করে। ওরা এগুলো ভুনা করে খেয়ে নিবে। এই খোসা ও আঁটিও আল্লাহর বড় নেয়ামত। এগুলো অযথা নষ্ট করা সমীচীন হবে না।

লক্ষণীয় যে, মিয়াসাহেব সাধারণত মেহমান গেলেই আম খাওয়াতেন। ছোট ছোট গরিব ছেলে মেয়েদের কে ডেকে এনে খাবারে শরীফ করতেন। এরপরও খোসা ও আঁটি ফালানোতে কী সর্তকতা!

আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টি আসলেই অনেক গভীর ও দূরদর্শী।

হযরতের অভ্যাস ছিল তার জন্য যে খাবার পরিবেশন করা হতো তার থেকে অল্প কিছু খেয়ে বাকিটুকু মহল্লার বাচ্চাদের ডেকে খাইয়ে দিতেন। খাবারের পর তিনি দস্তরখান থেকে রুটির টুকরা, মাছের কাঁটা,গোশতের হাড় আলাদা করে রুটির টুকরোগুলো ছোট ছোট করে চড়ুই পাখির জন্য রেখে দিতেন। মাছের কাঁটা,গোশতের হাড় এগুলো বিড়ালের জন্য দেয়ালের উপর রেখে দিতেন। আর দস্তরখান এমন জায়গায় ছেড়ে দিতেন যেখানে পিঁপড়া চলাফেরা করে।

একমাত্র প্রকৃত আল্লাহওয়ালাদের পক্ষেই আল্লাহ তাআলার নেয়ামত রাজির যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব।(আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থেঁ,১৩-১৫)

আকাবিরে দেওবন্দ একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন, এখন যারা আছেন তাঁরাও চলে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাঁদের খেদমতকে কবুল করুন। তাঁদের কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। আমাদেরকে তাঁদের আদর্শ অনুসরণের তাওফিক দান করুন।আমীন।

২০) "হাদিস সহীহ হলে সেটাই আমার মাযহাব" ইমামগণ এই কথা আসলে কাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন?

ইমাম শাফেয়ী সহ অন্যান্য ইমামগণ থেকে এমন বক্তব্য পাওয়া যায়। আর আসল কথা হল কালিমার অর্থ যিনি বুঝেন এমন প্রতিটি মুসলমানের বক্তব্য এমনই হওয়া উচিত।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে ইমামদের এই বাক্যের ভুল অর্থ করা হচ্ছে এবং এটিকে অপাত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আজকে আমরা দেখব ইমামগণ আসলে কাদেরকে লক্ষ্য করে এই বক্তব্য দিয়েছেন?

ইমাম নববীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা মাকদেসী রহ.এর বক্তব্য দেখুন। তিনি বলেন, এই কাজ তথা সহীহ হাদিস পেলে ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব কে ত্যাগ করে সেটাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া)এটা কেবল ওই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যিনি একজন মুজতাহিদ এবং তার ইজতিহাদ আহলে ইলমের কাছে স্বীকৃত। তিনি ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের প্রকৃত সম্বোধিত বা মুখাতাব।"

আর ইমাম নববী রহ. বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী যেই বক্তব্যটি দিলেন এর অর্থ এটা নয় যে কেউ কোনো সহীহ হাদীস দেখবে আর বলে দিবে এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব, এবং সে সেই হাদীসের উপর আমল করবে। বরং তার এই বক্তব্য তো ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি একধরনের ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন।

আর এর জন্য শর্ত হলো সেই মুজতাহিদ ব্যক্তির এই ধারণা প্রবল হতে হবে যে ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না অথবা "এই হাদীসটি যে সহীহ "সেটা জানতেন না।আর এটা তখনই জানা সম্ভব হবে যখন ইমাম শাফেয়ীর সমস্ত কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন শেষ হবে পাশাপাশি তাঁর যারা ছাত্র ছিলেন তাদেরও সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন শেষ করা সম্ভব হবে।

বলাবাহুল্য এটি খুবই কঠিন একটি শর্ত। খুব কম সংখ্যক লোকের পক্ষে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। (খেয়াল করুন! ইমাম নববীর তাঁর নিজ যুগের কথা বলছেন তখনই এমন যোগ্য আলিমের খোঁজ পাওয়া কঠিন ছিল আজকের যুগের কথা আর কি বলব!)

ইমাম নববী বলেন,আমি যেই শর্তগুলো উল্লেখ করলাম ইমামগণ এই শর্ত আরোপ করেছেন কেননা শাফেয়ী রহ.অনেক হাদিসকে দেখা ও জানা সত্ত্বেও বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করেছেন। কেননা তার নিকট সেই হাদিসের কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি অথবা সেটি মানসুখ হওয়া অথবা নবীজির সাথে খাস হওয়া ইত্যাদি কোন কারণ বা ব্যাখ্যা ছিল।

ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী যা বলেছেন তার উপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা কোনো ফকীহের পক্ষেই এককভাবে আমলের জন্য কোন হাদীসকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

শাফীয়ীদের মধ্যে থেকে যারা এমনটি করেছেন অর্থাৎ যে হাদীসটিকে ইমাম শাফেঈ কোন কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন তারা সেই হাদীসের উপর আমল করেছেন যেমন আবুল ওয়ালিদ ইবনে আবিল জারুদ-যিনি ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র ছিলেন-

তিনি বলেছেন "শিঙ্গা(কাপিং)যে লাগায় আর যার গায়ে লাগানো হয় উভয়ের রোজা ভেঙে যাবে" এই হাদীসটি সহীহ সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য অনুসারে সিংগা যে লাগাবে এবং যার গায় লাগাবে উভয়ের রোজা ভেঙে যাবে।

এরপর শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ ইবনে আবিল জারুদের বক্তব্যকে প্রত্যাখান করেছেন কেননা ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসটি সহীহ হওয়া সত্বেও ত্যাগ করেছিলেন মানসুখ হবার কারণে আর ইমাম শাফেয়ী সেই কথা কিতাবে বর্ণনাও করেছেন।"(আলমাজমু শরহুল মুহাযযাব)

তাহলে আমরা ইমামের সেই বক্তব্য অনুযায়ী ফয়সালা দানকারীর যোগ্যতা হিসেবে কয়েকটি বিষয়ে পেলাম। পাশাপাশি এটাও দেখলাম যে এর কোন একটি শর্ত পূরণ না করে ইমাম সাহেবের মত ত্যাগ করাটা ভুল,খোদ ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র ইবনে আবিল জারুদের ক্ষেত্রেই যেটা ঘটেছিল।

(শর্তসমূহ)

১.

সেই ব্যক্তি নিজে অন্তত মুজতাহিদ ফিল মাযহাব হতে হবে।

২.

তার ইজতিহাদী যোগ্যতা আহলে ইলমের কাছে স্বীকৃত হতে হবে।(যেমন ইমাম আবু ইউসুফ,ইমাম মুহাম্মাদ রহ.। তাঁদের ইজতিহাদী যোগ্যতা নিজ মাযহাব তো বটেই অন্যান্য মাযহাবের আহলে ইলমগণের কাছেও স্বীকৃত ছিল।)

৩.

তার এটা নিশ্চিত হতে হবে যে ইমাম শাফেঈ হাদীসটি সম্পর্কে জানতেন না অথবা এটা যে সহীহ সে সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। এজন্য তার ইমাম শাফেয়ীর সমস্ত কিতাব এবং তার ছাত্রদের সমস্ত কিতাব সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা থাকতে হবে।

৪.

তার কাছে এটা স্পষ্ট হতে হবে যে ইমাম এই বক্তব্যটি আরেকজনের অনুসরণ করে বলেছেন নিজের পক্ষ থেকে কোনো চেষ্টা ব্যয় করেননি এবং ইমাম সাহেব যার বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন সেটি স্পষ্ট ভুল ছিল।

এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে তখন ইমামের বক্তব্য ত্যাগ করতে হবে কেননা ইজতেহাদ কেবল সেখানেই করা বৈধ যেখানে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নস নেই।

তো উপরে আমরা ইমাম আবু শামা,ইমাম নববী,ইমাম ইবনুস সালাহ রহ.এর বক্তব্যে দেখলাম,ইমাম শাফেয়ী রহ.সহ অন্যান্য ইমামগণের ঐতিহাসিক সেই বক্তব্য আসলে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বা এর কাছাকাছি পর্যায়ের আলেমদের লক্ষ্য করে দিয়েছেন।

কয়েক জন সত্যিকারের যোগ্য ইমাম এই বক্তব্যের উপর আমল করতে গিয়ে পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছেন।(যেমন ইবনু আবিল জারুদের কথা এসেছে।তিনি ছাড়া আরো উদাহরণ আছে)

তাঁদের সাথে আমাদের যুগের আলেমদের তো কোন তুলনাই চলে না।কাজেই এখন আমাদের জন্য ইমামদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করাটা একেবারেই অনুচিত।

(আর যারা (ইলমের প্রথম ধাপ) আরবী জানেন কিন্তু আলিম নন অথবা আরবীও জানেন না। তাদের করনীয় কী সেটা সহজেই অনুমেয়।)

আল্লাহ তায়ালা বুঝার তাওফিক দান করুন।দ্বীনের ব্যাপারে দু:সাহসী হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

বি:দ্র:কারো প্রশ্ন হতে পারে তাহলে কি ইমামদের এই বক্তব্যের কোন বাস্তবতা নেই?

এর উত্তর হল,হ্যা, রয়েছে।ইমাম ইবনে হাজার রহ.এবিষয়ে একটি কিতাব লিখেছেন যেখানে ঐধরনের মাসআলাগুলো একত্রিত করা হয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী-যদি এই হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে মাসআলা এমন- এই কথা বলে গিয়েছিলেন।(ফাতহুল বারী)

(অবলম্বনে:আসারুল হাদীসীশ শরীফ,৫৮-৭৬)

২১) সালাফের ইলম অর্জনের পদ্ধতি।

ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে একটি কবিতা বর্ণিত আছে যেখানে তিনি ইলম অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে ছয় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।তন্মধ্যে অন্যতম হলো ওস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করা।

সালাফী এটির প্রতি খুব জোর দিতেন। কেননা ওস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করলে ছাত্র একসাথে দুটি জিনিস লাভ করে।

১. কোন ধরনের বাহুল্য ছাড়া সহীহ ইলম।

২. ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি আদব।

আদবের অনেক গুরুত্ব রয়েছে,কেননা বেয়াদব আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। আর ইলমের চেয়ে বড় রহমত আর কি হতে পারে?

একজন ছাত্রের জন্য তার শায়খ ও উস্তাদগণ বাপ-দাদাতুল্য। যেই ছাত্রের শায়েখ নেই যার কাছ থেকে সেই অর্জন করেছে, সে যেন বংশ পরিচয়হীন।

ইমাম নববী উলামায়ে কেরামের জীবনীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন, তাঁরা আমাদের ইমাম ও পূর্বসূরী, আমাদের পিতা-মাতার আসনে আসীন।"(তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত)

আরেক জায়গায় তিনি একজন ইমাম সম্পর্কে বলেন,"তিনি ফিকহের সিলসিলায় আমাদের এক দাদা(উস্তাদ)।"

ইলমের ক্ষেত্রে যার উস্তাদ নেই সালাফ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না।ইলমী পরিমন্ডলে তার কোন দামই ছিল না। ইলমী বিষয়ে তার সাথে কথা বলার উপযুক্ত মনে করা হতো না।

একবার খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ ইমাম আহমদকে বললেন, আপনি ইবনে আবি দাউদ এর সাথে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করুন। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, যাকে আমি কখনো কোন আলেমের দরজায় যেতে দেখি নি তার সাথে আমি কিভাবে কথা বলব? (আল ইলমা")

খতীবে বাগদাদী বর্ণনা করেন, একবার ইমাম আবু হানিফা কে বলা হলো মসজিদে একটি মজলিস বসেছে যারা ফিকহ নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মাঝে কোন শিরোমণি (উস্তাদ) আছে? তারা বলল না। তিনি বললেন তারা কখনোই ফকীহ হতে পারবেনা"।(আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ)

ইমাম মালেক কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি ইলমের জন্য সফর করেনি এবং ওলামায়ে কেরামের দরসে বসে নি তার কাছ থেকে কি ইলম গ্রহন করা যাবে? তিনি বললেন না।

ইমাম নববী বলেন,"কেউ যদি একটি মাসআলা দশটি কিতাবে দেখে এর পরও তার জন্য সে অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া বৈধ হবে না।

কেননা হতে পারে এই সমস্ত কিতাবের হাওয়ালার ভিত্তি কোন দুর্বল মতের উপর।"

এজন্যই যারা উস্তাদের কাছে সাহচর্যে না গিয়ে শুধু কিতাব থেকে ইলম অর্জন করে তারা নিজেরাও গোমরাহ হয়, অন্যদেরকেও গোমরাহ করে।

ইমাম আওযায়ী রহ.বলেন,এই ইলম খুবই দুর্লভ বস্তু ছিল যা যোগ্য ব্যক্তিরা অর্জন করত।যখন এটি কিতাবে চলে আসল তখন অযোগ্যরাও অনধিকার চর্চা শুরু করল"।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা রা.এর একটি ঐতিহাসিক উক্তি রয়েছে।তিনি বলেন,আহলে ইলমদের সাথে চলাফেরা,উঠা -বসার ব্যক্তির গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী নুয়াইম বিন আব্দুল্লাহ আলমুজমীর হযরত আবু হুরাইরা রা.এর দরবারে বিশ বছর যাওয়া আসা করেছেন।"

অপর বিশিষ্ট তাবেয়ী সাবিত আল বুনানী রহ.এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে,তিনি চল্লিশ বছর হযরত আনাস ইবনে মালিক রা:এর সোহবত অর্জন করেছেন।"

ইমাম মালেক রহ.এর বিশিষ্ট শাগরিদ হযরত নাফে রহ.বলেন,আমি চল্লিশ বছর ইমাম মালেক রহ.এর সাহচর্য গ্রহন করেছি। প্রতিদিন সকাল-দুপুর-বিকেল তাঁর সাথে কাটাতাম।"

ইলম অর্জন করার ক্ষেত্রে কিতাব,নেট,এ্যাপস কোন কিছুই উস্তাদের বিকল্প হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে রুশদ রহ.এর ঐতিহাসিক বক্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন,"প্রথম দুই শতাব্দীতে ইলম আহলে ইলমদের বক্ষে ছিল।এরপর যখন তা কিতাবে স্থানান্তরিত হল তখন সেই ইলমের চাবিকাঠি আহলে ইলমদের হাতেই রয়ে গেল। সুতরাং প্রতিটি ছাত্রের জন্যই এমন উস্তাদের প্রয়োজন যিনি ইলমের দিগন্ত উন্মোচন করবেন ও পথ দেখাবেন।"(আদাবুল ইখতেলাফ,১৭৪)

প্রিয় ভাই!আসুন, সবশেষে সালাফের মাঝে বহুল প্রচলিত একটি ওসীয়ত মেনে চলার চেষ্টা করি।

"তুমি যেখানেই থাকো, কোন ফকীহের সাহচর্যে থেকো।"

(আদাবুল ইখতেলাফ,১৬২-১৭২,অবলম্বনে)

২২) সালাফের শিক্ষাদান পদ্ধতি।

একজন দরদী ও যত্নশীল মা যেমন তার সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুকে তার উপযোগী খাবার ও পরিবেশের ব্যবস্থা করে এবং ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সঠিক সময়ে তাকে উপযোগী খাদ্যে অভ্যস্ত করে তোলে।

ঠিক তেমনি সালাফ তাদের ছাত্রদের ছোট বিষয়গুলো আগে শিখাতেন এরপর ধীরে ধীরে বড় স্পর্শকাতর' বিষয়গুলোর দিকে যেতেন।

ছাত্রদেরকে তাদের মেধা-মনন ও বুঝ অনুযায়ী শিক্ষাদান করতেন।

তাদের নিকট একজন প্রকৃত আলিমে রব্বানীর এটিই ছিল পরিচয়।

ইমাম বুখারী তাঁর "সহীহ"তে কিতাবুল ইলম এ বলেন, রব্বানী বলা হয় যিনি মানুষকে ইলমের বড় জটিল অধ্যায়ের শিক্ষাদানের পূর্বে ছোট বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়।

ইমাম বায়যাবী তার তাফসীরে" তারবিয়া" শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন" কোন জিনিসকে ধীরে ধীরে তার পূর্ণতায় পৌছে দেয়া।"

তো একজন ওস্তাদ হল মুরুব্বী তার ছাত্রের জন্য, যিনি তাকে অল্প অল্প করে এল শিক্ষা দিয়ে একসময়ে পূর্ণতায় পৌঁছে দিবেন।

ওলামায়ে কেরামগণ এই চিন্তা থেকেই মুতুন(টেক্সট) ও মুখতাসারাত(সংক্ষিপ্ত কিতাব) রচনা করতেন। যেখানে দলিল উল্লেখ ছাড়া সহজ ভাষায় এক মাযহাব অনুযায়ী সমস্ত মৌলিক মাসআলা একত্রে বর্ণনা করা হয়।

ছাত্র যখন এগুলো আত্মস্থ করতে সক্ষম হতো তখন বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থে এক মাসআলায় বিভিন্ন মত, সেগুলোর পক্ষে-বিপক্ষে দলিল নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দিতেন।

এভাবে ছাত্রদেরকে ধীরে ধীরে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানে পরিপক্কতা ও দূরদর্শিতা অর্জিত হয়।

পক্ষান্তরে যারা ওস্তাদের কাছে ধীরে ধীরে ছোট থেকে পর্যায়ক্রমে বড় বড় বিষয় এর অর্জন করার পরিবর্তে নিজে নিজেই কিতাব খুলে বাছবিচার ছাড়া পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনের ব্যাধি পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত: তারা শুযুয তথা বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়।নিজের বোধশক্তির উপর মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হবার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়েকেরাম অথবা উম্মতের ইজমা থেকেও অনেক সময় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

দ্বিতীয়তঃ তারা উম্মতের ইমামগণ ও ওলামায়ে কেরামের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন।একজনের কথার সূত্র ধরে অন্যজনকে ছোট করেন।

ইমাম হাসান বসরী রহ.।সালাফের শ্রেষ্ঠ নমুনা। তাঁর মর্যাদা নিয়ে কত উলামা কিতাব লিখেছেন।তিনি তো এমন ব্যক্তি যাকে কোন ময়দানেই হারানো সম্ভব হয় না।

যদি বলা হয় "অমুক সবচেয়ে বড় জ্ঞানী"।তাহলে বলতে হবে হ্যাঁ,হাসান বসরী বাদ দিয়ে।

যদি বলা হয় "অমুক তো সবচেয়ে বড় দুনিয়াবিরাগী"।তাহলে এটা যোগ করতে হবে যে,হ্যাঁ,ঠিক আছে তবে হাসান বসরীর চাইতে বড় নয়।

অর্থাৎ সবক্ষেত্রে তাঁকে বাদ দিয়েই হিসেব করতে হয়।অথচ দু-চার কলম পড়াশোনা করে আজকাল কেউ কেউ তাচ্ছিল্যভরে বলে "আরে হাসান বসরী তো মুদাল্লিস!

শায়খ আব্দুল করিম রেফায়ী খুব বাস্তব একটি কথা বলেছিলেন।"বড়দের খাবার ছোটদের জন্য বিষতুল্য"।

শুরুতেই শাস্ত্রীয় উচ্চ স্তরের কিতাব ও স্পর্শকাতর'আলোচনাগুলোতে হাত দেয়ার দরুন আজকাল অনেকের তাহকীকের "বদহজম"হচ্ছে ।(আদাবুল ইখতেলাফ,১৭২-১৮২)

যেখানেই এই দুই ব্যাধি তথা বিচ্ছিন্ন মত গ্রহন ও ইমামদের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা, তাচ্ছিল্য, তাদের মতকে উপেক্ষা করার প্রবণতা পাওয়া যাবে, বুঝতে হবে সে বা তারা যথাযথ উপায়ে ইলম অর্জন করেনি।

হয় উস্তাদ ছাড়া নিজে নিজে পড়াশোনা করেছে অথবা ইলমের ধারাবাহিকতা তথা ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় বিষয় অর্জনের ধারা লঙ্ঘন করেছে।

আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাধি থেকে উম্মতকে হেফাজত করুন।ইলমকে সালাফী মানহাজে অর্জন করার তাওফীক দান করুন।আমীন।

২৩) ইমামগণের অন্তরে হাদীসের মর্যাদা কেমন ছিল?

(যাঁরা নিজেদের পুরো জীবনটাই কুরআন-হাদীসের গবেষণায় কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁদের অন্তরে এর মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠা খুবই অবান্তর এবং তাঁদের প্রতি বড় জুলুম। এরপরও নানা প্রোপাগান্ডার জবাবে কিছু কথা বলতেই হয়।)

ইমামে আযম আবু হানিফা রহ.বলেন,"যতদিন মানুষের মাঝে হাদীস অন্বেষণকারীরা থাকবেন ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

আর যখন হাদীস ব্যতিরেকে ইলম অর্জন করতে যাবে তখন ফাসাদ সৃষ্টি হবে।"

তিনি আরো বলেছেন,"তোমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রদান থেকে বিরত থাকবে। তোমাদের জন্য সুন্নাহর অনুসরণ অপরিহার্য।সুন্নাহ থেকে যে বেরিয়ে যাবে সে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"

ইমাম শাফেয়ী রহ.বলেন, আমি যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করে সেটির বিপরীত মত পোষণ করি তাহলে কোন ভুখন্ড আমাকে জায়গা দিবে?

আরেক দিন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, ইমাম বুখারীর শায়খ হুমাইদী রহ.তাঁকে বললেন, আপনি কি এটা গ্রহণ করেন?

ইমাম শাফেয়ী রহ. বললেন, তুমি কি আমাকে ঝুঁটি মাথায় গির্জা থেকে বের হতে দেখেছো? যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শুনব আর সেটি গ্রহণ করব না?

ইমাম মালেক রহ.হাদীসের খুব চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন,সুন্নাহ হলো নূহ আ.এর নৌকা,যে তাতে উঠতে পেরেছে সে মুক্তি পেয়েছে,আর যে পিছে পড়ে গেছে সে ডুবে মরেছে।"

ইমাম আহমাদ রহ.বলেন,যে রাসুলের(সা.) হাদীস প্রত্যাখান করল সে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।"

আরেক দিন তিনি বললেন,এই যুগে -ইমাম আহমাদ রহ.এর যুগে-হাদীস অন্বেষণের প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী তারচেয়ে অন্য কোন কিছুর প্রতি এতোটা মুখাপেক্ষী নয়।

তাঁর ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল কেন? তিনি বললেন,বিদআতের বিস্তার ঘটেছে,তাই যার কাছে হাদীস নেই সে তাতে লিপ্ত হয়ে যাবে।"(আসারুল হাদীসীশ শরীফ,২৬-২৭)

সুন্নাহর মর্যাদার ব্যাপারে ইমামগণের বহু বক্তব্য রয়েছে। এখানে নমুনা হিসেবে কিছু উল্লেখ করা হল।ইমামগণের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও একটি জায়গায় সবাই একমত।আর সেটা হলো"সুন্নাহকে আকড়ে ধরা"এবং "যারাই দুনিয়া আখেরাতে কামিয়াবী চায় তাদের জন্য সুন্নাহ ছাড়া গত্যন্তর নেই"।

ইমামগণের এই সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও যারা তাঁদের উপর হাদীস অবমূল্যায়নের অপবাদ আরোপ করে তাদের কখনো সৎউদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

২৪) হাদীস সহীহ হলেই কী সব ইখতেলাফ নিরসন হয়ে যাবে?

১ম পর্ব

কোন কোন ভাই এমনটা মনে করেন যে,সবাই যদি সহীহ হাদীস গ্রহন করে তাহলেই তো সব ইখতেলাফ নিরসন হয়ে যায়,আর কোন ঝামেলা থাকে না।

কথাটা শুনতে ভালো মনে হলেও বাস্তবতা এর বিপরীত। আসবাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা(ফুকাহাগণের ইখতেলাফের কারণ) সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের পক্ষেই কেবল এধরনের কথা বলা সম্ভব।

হাদীস সহীহ হওয়া তো বটেই বরং উভয় পক্ষের দলীল একই হাদীস হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে ইখতেলাফ হতে পারে।

আজকে তেমনই একটি কারণ আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ইবনে কুতাইবা রহ.বলেন,আরবী ভাষায় এরাব রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যেটিকে আরবী বাক্যের সৌন্দর্য ও অলংকার বানিয়েছেন।(শাব্দিকভাবে)সমপর্যায়ের আবার অর্থগতভাবে ভিন্ন দুটি বাক্যের মধ্যে এরাবের মাধ্যমেই পার্থক্য করা হয়।

যেমন- ফায়েল,মাফউল।

যখন এমন হয় যে ফেয়েলটি ফায়েল বা মাফউল উভয়টির জন্যই প্রযোজ্য তখন কেবল এরাবের মাধ্যমেই পার্থক্য করা সম্ভব, এছাড়া গত্যন্তর নেই।

যেমন-কেউ বলল,هذا قاتل أخي.(লামের উপর তানবীনসহ)তাহলে অর্থ হবে এ লোক আমার ভাইকে হত্যা করে নি(তবে করতে পারে)।

আর যদি বলে,هذا قاتل أخي.(লামের উপর তানবীনবিহীন, ইযাফতের সাথে ব্যবহার হলে)।

তাহলে অর্থ হবে,এই লোক ভাইকে হত্যা করেছে।"(তাবীলু মুশকিলীল কুরআন)

এবার একটি মাসআলা দেখুন!যদি কেউ কোন ছাগল জবাই করার পর সেটার পেট থেকে মৃত বাচ্চা বের হল, এখন এটাকে কি আবার জবাই করতে হবে?

নাকি জবাই ছাড়াই খাওয়া বৈধ হবে?

এ প্রসঙ্গে যে হাদীসটি এসেছে সেটা হল,ذكاة الجنين ذكاة أمه.

ইমাম ইবনুল আসীর বলেন, এই হাদীসটি ذكاة أمه(শব্দটি) رفع (এখানে পেশ)ও)نصبএখানে যবর) উভয় ভাবেই পড়া যায়।

যারা এটিকে পেশ পড়েন তারা এটিকে (ذكاة أمه(পূর্বের মুবতাদার খবর বিবেচনা করেন।

তখন হাদীসের অর্থ হয়:মা ছাগলের জবাইটাই শাবকের জবাই বলে গণ্য হবে। নতুন করে জবাইয়ের দরকার নেই।

আর যারা এটিকে যবর পড়েন তারা এখানে একটি كاف تشبيه (উপমা)উহ্য আছে বলে ধরে নেন।

তখন হাদীসের অর্থ হয়,"মা ছাগলের জবাইয়ের ন্যায় শাবকের জবাই করতে হবে।"সুতরাং উভয়টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন জবাই জরুরী।

এখন ইমাম শাফেয়ী রহ.প্রথম মতটি গ্রহন করেছেন।আর ইমাম আবু হানিফা রহ.,ইমাম ইবনে হাযম রহ. দ্বিতীয় মতটি গ্রহন করেছেন।(আসারুল হাদীসীশ শরীফ,৫২-৫৪)

এটি একটি উদাহরণ। এছাড়া আরো উদাহরণ আছে যেখানে আরবী ভাষার এরাবের একটু পার্থক্যের কারণে আকাশ-পাতাল ইখতেলাফ হয়ে যায়।

আরবী ভাষা জানা ছাড়াই যারা ইখতেলাফী মাসআলায় মতামত দেয়ার চেষ্টা করেন তাদের এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মাথায় রাখা উচিত।

২৫) প্রসঙ্গ:ফিকহে হানাফীর সনদ"।

বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে, কিছু ভাইয়ের প্রচারণার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগছে যে,ফিকহে হানাফীর মাসআলাগুলোর সনদ আছে কিনা?

প্রশ্নটা শুরুতে হালকা মনে হলেও এর ফলাফল গুরুতর।কারন এই একই প্রশ্ন চার মাযহাবের বিরুদ্ধে, বরং হাদীস,তাফসীরসহ সকল ইসলামী শাস্ত্র নিয়েও হতে পারে, ইসলামের দুশমনরা যেটা অনেক আগে থেকেই করে আসছে।

এই প্রশ্নের জবাবে আজকে সংক্ষেপে সহজবোধ্য কিছু কথা আলোচনা করা যাক।

প্রথমে আমরা মাথায় রাখি যে,ফিকহে হানাফীর মাসআলাগুলো তিন প্রকার।

১.

মাসাইলুল উসুল বা জাহিরুর রিওয়ায়াহ।যে সকল মাসআলা ইমামত্রয় তথা আবু হানিফা,আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.থেকে বর্ণিত ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.এর বিখ্যাত ছয় কিতাবে উল্লিখিত।(কিতাব ছয়টি হল-জামিউস সগীর,জামিউল কাবির,সিয়ারুস সগীর,সিয়ারুল কাবির,মাবসুত,যিয়াদাত)

২.

নাদিরুর রিওয়ায়াহ।যে সকল মাসআলা বিখ্যাত ছয় কিতাব ছাড়া ইমাম মুহাম্মাদের অন্য কিতাব বা অন্যান্য ইমাম যেমন আবু ইউসুফ,হাসান বিন যিয়াদের কিতাবে এসেছে।

৩.

ফাতাওয়া ওয়াল ওয়াকিআত।যে সকল ক্ষেত্রে ইমামদের থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা না পেয়ে তাঁদের নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে পরবর্তী ফকীহগণ যে

মাসআলাগুলো উৎসারণ করেছেন।(শরহে উকুদের সুত্রে উসুলুল ইফতা,৩১৮)

মাসআলাগুলোর এই শ্রেণী বিন্যাস দেখলেই যে কেউ আন্দাজ করতে পারবে যে,সেগুলোর বিশুদ্ধতা ও যথাযথ মান নিশ্চিত করতে আহনাফ উলামায়ে কেরাম কতটা কষ্টসাধ্য, বিস্তৃত ও জটিল খেদমত আন্জাম দিয়েছেন।

হানাফী ফকীহগণ সনদ তো বটেই, বরং সনদবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও কোন মাসআলা মাযহাবের ইমামদের থেকে বর্ণিত আর কোনটা তাঁদের নীতিমালা থেকে উৎসারিত তাও গবেষণা করে নির্ণয় করেছেন।

এরপর ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসআলাগুলোর সনদ কোন পর্যায়ের? কোনগুলো মুতাওয়াতির বা মাশহুর সনদে বর্ণিত (জাহিরুর রিওয়ায়াহ)আর কোনগুলো খবরে ওয়াহিদ সনদে বর্ণিত (নাদিরুর রিওয়ায়াহ) সেগুলোরও একদম পরিষ্কার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসআলাগুলো কি হুবহু এভাবেই বর্ণিত হয়েছে নাকি মুল কথাটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছিল পরবর্তীতে কোন ফকীহ তা ব্যাখ্যা করেছেন?ব্যাখ্যাকৃত হলে সেই ব্যাখ্যা কোন ফকীহ করেছেন সেটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

বাকী রইল ফাতাওয়া ওয়াল ওয়াকিআত বা মুস্তাখরাজ মাসআলা। সেক্ষেত্রেও পরবর্তী ফকীহগণের গবেষণাকৃত মাসআলাগুলোর মধ্য থেকে কোনগুলো গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে আর কোনগুলোতে আপত্তি হয়েছে - এসকল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

মাবসুতে সারাখসী,বাদায়েউস সানায়ে, ফাতহুল কাদীর,শরহু মুখতাসারি ত্বহাবীসহ ফিকহে হানাফীর "শুরুহ"শ্রেণীর গ্রন্থে এধরনের পর্যাপ্ত আলোচনা রয়েছে।

বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো ফিকহে হানাফীতে এমন গ্রন্থও রয়েছে যেখানে পাঠকের সুবিধার্থে প্রত্যেক শ্রেণীর মাসআলা আলাদা আলাদা শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে।যেমন "মুহিতে রাযাভী"নামক গ্রন্থে প্রতি অধ্যায়ে প্রথমে "জাহিরুর রিওয়ায়াহ"এরপর"নাদিরুর রিওয়ায়াহ"এরপর "ফাতাওয়াল মাশাইখ"শ্রেণীর মাসআলা উল্লিখিত হয়েছে।

এভাবেই যুগে যুগে বিভিন্ন ধাপে অসংখ্য উলামায়ে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে হানাফী ফিকহ।

এই বিষয়গুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে আশাকরি ফিকহে হানাফীর সনদ সম্পর্কে কোন ধরনের অমুলক প্রশ্ন উঠার কথা না।

আল্লাহ তায়ালা ফকীহগণের মেহনতকে কবুল করুন। তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

("উসুলুল ইফতা" ও মুহাক্কিকুল আসর মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা:বা:এর প্রবন্ধ"ফিকহে হানাফীর সনদ" অবলম্বনে)

২৬) কুরআন কী এতই সহজ যে, সাধারণ পাঠক নিজে নিজেই বুঝে নিতে পারবে?

আল্লাহর বাণী ولقد يسرنا القرآن للذكر("নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি") এর সহীহ ব্যাখ্যা:

আমাদের সমাজে এই আয়াতের একটি নতুন ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে যে, যেহেতু কুরআন মাজীদকে আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দিয়েছেন সেহেতু এর ব্যাখ্যার জন্য লম্বা-চওড়া জ্ঞান-বিদ্যার দরকার কী?বা তাফসীর করার জন্য, কুরআন থেকে বিধি-বিধান গ্রহনের জন্য আলেম হবারই বা দরকার কোথায়?

বলাবাহুল্য যে,আয়াতটির এ ধরনের ব্যাখ্যা চরম বিভ্রান্তিপূর্ণ ও উলুমুল কুরআন তো বটেই,দ্বীনি ইলম চর্চার ন্যুনতম কায়দা-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞাতপ্রসুত।

আসলে বিষয়টি হলো, কুরআনে কারীমের আয়াত দুই ধরনের।

১.

যে সকল আয়াতে সাধারণ উপদেশমূলক কথা, শিক্ষনীয় ঘটনাবলী,ওয়াজ ও নসীহতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। যেমন-দুনিয়ার নশ্বরতা,জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ,আল্লাহভীতি ও আখেরাতের চিন্তা জাগ্রতকারী বিষয়াবলী ইত্যাদি।

এ জাতীয় আয়াত নিঃসন্দেহে সহজ।যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে সে তা বুঝে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।উপরে বর্ণিত আয়াতে এ জাতীয় শিক্ষামালা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে,আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি।"

খোদ আয়াতের মধ্যেই للذكر(উপদেশের জন্য)শব্দটি একথারই নির্দেশ করে।

২.

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে যেসকল আয়াতে আইন -কানুন,বিধানাবলী,আকীদা-বিশ্বাস ও উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।এ জাতীয় আয়াত যথাযথভাবে বোঝা ও তা থেকে হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করা সবার কাজ নয়।

এটা কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যারা দ্বীনি ইলমে বুৎপত্তি ও পরিপক্কতা অর্জন করেছেন এবং অন্যদের কাছেও স্বীকৃত হয়েছেন।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যাদের মাতৃভাষাই ছিল আরবী,তাই আরবী শেখার জন্য কোথায় যাবার দরকার ছিল না।তারাও কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন।

মুয়াত্তায়ে মালেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কেবল সূরা বাকারা শিখতে পুরো আট বছর ব্যয় করেছেন।(৪৬৫)

মুসনাদে আহমাদে (১২২১৫) হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সূরা বাকারা,ও আলে ইমরান শিখে ফেলতে তার মর্যাদা আমাদের দৃষ্টিতে অনেক উঁচু হয়ে যেত।

দেখুন ভাবার বিষয় হল সাহাবায়ে কেরামের মাতৃভাষা আরবী ছিল তারা আরবি কাব্য- সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন সামান্য একটু মনোযোগ দিলেই লম্বা লম্বা কবিতা তাদের মুখস্থ হয়ে যেত কিন্তু তাদেরও কোরআনে মাজীদ মুখস্ত করতে ও তার অর্থ বুঝতে এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন কেন হল মাত্র একটি সূরা শিখতে তাদের আট বছর লাগার কারণ কি হতে পারে?

এর কারণ কেবল এটাই ছিল যে কোরআনে মাজীদ ও তার জ্ঞান রাশি শেখার জন্য কেবল আরবি ভাষার দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না বরং সেজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়া এবং তার থেকে যথানিয়মে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য ছিল।

এখন বলুন যারা আরবি ভাষা সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করি অথবা কেবল অনুবাদ পড়েই মুফাসসিরে কোরআন হয়ে যাবার দাবি করে তাদের এ ধরনের প্রবণতা কতো মারাত্মক ধৃষ্ঠতা ও ইলমে দ্বীনের সাথে ভয়াবহ তামাশা নয় কি?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন," যে ব্যক্তি কোরআন সম্বন্ধে না জেনে কোন কথা বলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।"(তিরমিযী,২৯৫১)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন।

(উলুমুল কুরআন,৩৬২-৬৪)

২৭) হানাফীরা কি হাদিসের বিরোধিতা করে?

ঈসা ইবনে আবান রহ.। বিশিষ্ট হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকীহ। আজকে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যাবার গল্প শোনাবো।

মুহাম্মদ বিন সামাআহ বর্ণনা করেন, আমরা যে মসজিদে নামাজ পড়তাম অর্থাৎ যেখানে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ.নামাজ পড়তেন এবং

ফিকহের দরস দিতেন সেখানে ঈসা ইবনে আবানও নামাজ পড়তেন। আমি তাকে বলতাম যে আসুন মুহাম্মাদ ইবনে হাসান এর দরসে বসুন। তিনি উত্তর দিতেন এই গোষ্ঠী তো হাদিসের বিরোধিতা করে। ঈসা হাদীসে পারদর্শী ছিলেন।

একদিন তিনি আমাদের সাথে ফজরের নামাজ পড়লেন। সেদিন ইমাম মুহাম্মাদের দরস ছিল। সেদিন তাকে দরসে না বসিয়ে আর ছাড়লাম না।

ইমাম মুহাম্মাদের নামাজ শেষ হলে আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম"ইনি আপনার ভাতিজা। আবান ইবনে সাদাকার ছেলে। তিনি অনেক মেধাবী ও হাদীসের উপর পারদর্শী।আমি তাকে আপনার মজলিসে আসতে বললে সে বলে যে,আমরা নাকি হাদীসের বিরোধিতা করি।

ইমাম মুহাম্মাদ তার প্রতি মনোযোগী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস!তুমি কোথায় দেখলে যে আমরা হাদিসের বিরোধিতা করি?

আমাদের কাছ থেকে না শুনে আমাদের উপর অভিযোগ করো না।

এরপর ঈসা ইবনে আবান হাদীসের পঁচিশটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করলেন।ইমাম মুহাম্মাদ একে একে সবগুলোর উত্তর দিলেন।

দেখালেন,কোনটা কোনটা রহিত হয়েছে। সেগুলোর ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উত্থাপন করলেন।

মজলিস থেকে বের হবার সময় ঈসা ইবনে আবান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,(এতদিন)আমার আর আলোর মাঝে একটি পর্দা ছিল যা এখন উঠে গেছে। আমি ভাবতে পারিনি আল্লাহর দুনিয়ায় এমন ব্যক্তিও আছেন।

এরপর তিনি ইমাম মুহাম্মাদের সাহচর্যে থাকতে লাগলেন, একপর্যায়ে বড় ফকীহ হয়ে গেলেন।

(আসারুল হাদীসীশ শরীফ,১২৫-১২৬)

২৮) হুফফাজে হাদীস মুহাদ্দিসীনদের চোখে ইমাম আবু হানিফা রহ.

ইমামে আযম আবু হানিফা রহ.এর হাদীস চর্চা সম্পর্কে পূর্বে একটি পোস্টে কিছু আলোচনা করেছিলাম।আজকে হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমামগণ তাঁর ব্যাপারে কেমন ধারণা পোষণ করতেন সে প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

উলুমুল হাদীসের বিশাল গ্রন্থভান্ডারে"তাযকিরাতুল হুফফাজ" বা "বিশিষ্ট হাফেযুল হাদীস মুহাদ্দিসীনদের জীবনী"শিরোনামে একধরনের গ্রন্থ রয়েছে।সেখানে তাঁরা কেবল ঐ সকল মুহাদ্দিসগণের জীবনী উল্লেখ করেন যাঁরা নিজেরা নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃত তো বটেই, পাশাপাশি অন্যান্য রাবী বা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই ও হাদীসের সহীহ-যয়ীফ জানার জন্যও তাঁদের শরণাপন্ন হতে হয়।

এই বিষয়ে এই শিরোনামেই ইমাম যাহাবী রহ.এর বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে। সেখানে তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.কে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন।

তাঁর কালত্তীর্ণ গ্রন্থ "সিয়ারু আলামিন নুবালা"তে বলেছেন,কুফাবাসীদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ হলেন হযরত আলী রা.ও ইবনে মাসউদ রা.। তাঁদের ছাত্রদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ হলেন আলক্বামা রহ.। তাঁর ছাত্রদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ হলেন ইবরাহীম নাখয়ী রহ.।

তাঁর ছাত্রদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ হলেন হাম্মাদ রহ.। তাঁর ছাত্রদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ হলেন আবু হানিফা রহ.। তাঁর ছাত্রদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ হলেন আবু ইউসুফ রহ.।

আবু ইউসুফ রহ.এর ছাত্ররা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ ছিলেন মুহাম্মাদ বিন হাসান রহ.।

আর মুহাম্মাদ রহ.এর ছাত্রদের মাঝে সবচাইতে বড় ফকীহ ছিলেন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেয়ী রহ.।"

*

ইমাম ইবনু আব্দিল হাদী আলহাম্বলী রহ. তাঁর কিতাব"মুখতাসার ফি তাবাকাতি উলামাইল হাদীস"এ ইমাম আবু হানিফা রহ এর জীবনী এনে ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেন,আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত বিন যুত্বী আততাইমী। বিশিষ্ট ইমাম,ইরাকের ফকীহ,হযরত আনাস বিন মালেক রা.যখন কুফায় এসেছেন তখন একাধিক বার তাঁকে দেখেছেন।

হযরত আতা,নাফে রহ.প্রমুখ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে ইমাম ওয়াকী,ইয়াযিদ বিন হারুন প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.বলেন,আবু হানিফা মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ফকীহ"।ইমাম শাফেয়ী রহ.বলেন,"ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষ আবু হানিফা রহ.এর মুখাপেক্ষী"।

ইয়াযিদ বলেন,আমি ইমাম আবু হানিফা রহ থেকে অধিক বুদ্ধিমান ও অধিক তাকওয়ার অধিকারী আর কাউকে দেখিনি"।

ইমাম আবু দাউদ রহ.বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আবু হানিফা রহ এর উপর রহম করুন।তিনি ইমাম ছিলেন।

শামের বিশিষ্ট শাফেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আসসালেহী তাঁর কিতাব"উকুদুল জুমান"এ বলেন, ইমাম আবু হানিফা উঁচু পর্যায়ের হুফফাজে হাদীস (হাদীস বিশারদ)ছিলেন।ইমাম যাহাবী রহ.তাঁকে "তবাকাতে হুফফাজে" উল্লেখ করে খুবই ভালো ও যথাযথ কাজ করেছেন।

হাদীস নিয়ে তাঁর বিপুল চর্চা না থাকলে তাঁর পক্ষে মাসআলা উদ্ভাবন করা সম্ভব হতো না।"(মাকানাতুল ইমাম আবু হানিফা ফিল হাদীস,৬০-৬৫)

আল্লাহ তাআলা উম্মাহের এই মহান ইমামের কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। আমীন।

২৯) আলেম-উলামারা কি শরীয়তের ঠিকাদারী নিয়েছেন?

কিছু ভাই এই প্রশ্ন তোলেন যে, কুরআনে কারীম সমস্ত মানুষের হেদায়াতের কিতাব। সুতরাং নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সবারই এই কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল ওলামায়ে কেরামের ঠিকাদারী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কোন সন্দেহ নেই যে, এই আপত্তিটি নিতান্তই আবেগী ও ভাসাভাসা মনোভাবের ফল। বাস্তবতা ও শাস্ত্রীয় গভীরতার সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

কুরআনে কারীম সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের আসল পুঁজি। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে যেকোনো মুর্খ-অশিক্ষিত ব্যক্তিই কি কুরআনে কারীমের সুক্ষ্ণ হুকুম-আহকাম ও আকিদাগত বিষয় আহরণ করতে সক্ষম হবে?

এবং এই উদ্দেশ্য (মাসআলা উদ্ভাবন)অর্জনের জন্য কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কি প্রয়োজন নেই?

একটি উদাহরণ দেখুন। কোন আইন বিশারদ বা দার্শনিক অথবা কোন ডাক্তার যদি কোন বই লিখেন তাহলে এটা তো খুবই স্পষ্ট কথা যে,সমগ্র মানবজাতির উপকার করাই তার উদ্দেশ্য থাকে।

এখন শাস্ত্রীয় বিষয় সম্পর্কে যার প্রাথমিক ধারণাটুকুও নেই সে যদি এই আপত্তি করে যে এই বইটি তো সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ এই লেখা হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের ঠিকাদারী কেন চলবে?

এই কথা যে লোক বলবে তার বোধবুদ্ধির উপর মাতম করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

যদি কোন কিতাব থেকে যথাযথ ভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেয়াকে "ঠিকাদারী" আখ্যা দেয়া হয় তাহলে পৃথিবীর কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই মূর্খ ও অশিক্ষিতদের হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

আসল কথা হল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাই মানবজাতির কল্যানের জন্য নিবেদিত। কিন্তু সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য দুটি পদ্ধতিই নির্ধারিত।

১.

হয়তো মানুষ এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান যথাযথ উপায়ে শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অর্জন করবে। এর জন্য যত মেহনত ও সময় ব্যয় করা দরকার সেটি করবে।

২.

আর যদি সে এটি করতে সক্ষম না হয় তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো যারা এই শাস্ত্রের পেছনে সারা জীবন ব্যয় করেছেন তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে আস্থা জন্মায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনুসরণ করবে।

এই দুই পথ ব্যতীত যে ব্যক্তি তৃতীয় কোন রাস্তা অবলম্বন করবে সে নিজের ও শাস্ত্রের - উভয়ের- উপরই জুলুম করবে। কুরআন ও সুন্নাহের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

নিঃসন্দেহে কোরআন ও সুন্নাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়েত স্বরূপ। কিন্তু এই হেদায়েত অর্জনেরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

মানুষ হয়তো নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করে নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করবে।

অথবা ঐ সকল লোকদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনুসরণ করবে যারা এই ইলম অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই শতভাগ যৌক্তিক নিয়মকে "ঠিকাদারী" আখ্যা দেয়া "নিছক আবেগপ্রসূত" ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

সারা দুনিয়ায় কি কেবল কুরআন-হাদিসই এমন বেওয়ারিশ হয়ে গেছে যে সেগুলো থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের জন্য কোন যোগ্যতার শর্ত আরোপ করার দরকার নেই?

এবং যে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা এই ইলমের মধ্যে রাফখাতার মতো অনুশীলন চালাবে?

(উলুমুল কুরআন,৩৬৪-৩৬৫)

৩০) মক্কী সূরা-মাদানী সূরা: পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য।

আমরা পবিত্র কুরআন মাজিদের প্রতিটি সূরার পরিচিতিতে আয়াত ও রুকু সংখ্যার পাশাপাশি সুরাটি মক্কী না মাদানী সে বিষয়ক তথ্য দেখতে পাই। এখন মক্কী-মাদানী বলতে কী বোঝানো হয় সেটা হয়তো কারো কারো কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে।

তাই আজকে আমরা সংক্ষেপে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।

কোন কোন মুফাসসির এর মতে, যে সকল আয়াত মক্কা শহরে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো "মক্কী আয়াত"।

আর যে সকল আয়াত মদীনা শহরে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো "মাদানী আয়াত"।

তবে এই ব্যাখ্যার উপর কিছু যৌক্তিক প্রশ্ন উঠায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরগণ তা গ্রহণ করেননি।কারন কিছু আয়াত মিনা,আরাফাতসহ অন্যান্য এলাকায় অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে "মক্কী আয়াত"ই গণ্য করা হয়।

তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরগণের মত হল, যে সকল আয়াত মদিনায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো "মক্কী আয়াত"।

আর হিজরতের পরে যে সকল আয়াত নাজিল হয়েছে সেগুলো "মাদানী আয়াত"।

অর্থাৎ আয়াত মক্কী-মাদানী হওয়ার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার যুগ ধর্তব্য,স্থান নয়।

মক্কী মাদানী আয়াত কিভাবে চিহ্নিত হলো?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মক্কী- মাদানী চিহ্নিত করে যাননি। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন -যারা কুরআনে কারীমের খেদমতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন- তারা এটি নির্ণয় করেছেন।

বিশিষ্ট সাহাবীগণ কোরআনের আয়াত নাযিলের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানতেন। হযরত আলী রা.বলেছেন, আল্লাহর কসম!

আমি প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে জানি যে সেটি দিনে অবতীর্ণ হয়েছে না রাতে? পাহাড়ে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি সমতল ভূমিতে?

অধিকাংশ আয়াত তারাই নির্ণয় করে গিয়েছেন।এর বাইরে কিছু আয়াত বিভিন্ন আলামত ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরবর্তী ইমামগণ নির্ণয় করেছেন।তবে ইজতেহাদী বিষয় হবার কারণে এই আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে ইখতেলাফ হয়ে গেছে।

সুরা কখন মক্কী-মাদানী হয়?

যে সূরার অধিকাংশ আয়াত মক্কী সেটি "মক্কী সুরা" আর যে সূরার অধিকাংশ আয়াত মাদানী সেটি "মাদানী সুরা" হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

তবে কোন কোন সুরায় সব আয়াতই মক্কী আবার কোনো কোনোটিতে সব আয়াতই মাদানী।

মক্কী সুরার আলামত:

১.

যে সকল সুরায় "كلا"(কখনোই নয়) শব্দটি রয়েছে সেগুলো মক্কী।

২.

যে সকল সুরায় সিজদায়ে তেলাওয়াত রয়েছে সেগুলো মক্কী।

৩.

সুরা বাক্বারা ব্যতীত অন্য যে সকল সুরায় হযরত আদম আ. ও ইবলিসের ঘটনা এসেছে সেগুলো মক্কী।

৪.

যে সকল সুরায় يا أيها الناس তথা হে মানবসকল!বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো সাধারণত মক্কী।

মাদানী সুরার আলামত:

১.

যে সকল সুরায় জিহাদের বিধান এসেছে সেগুলো মাদানী।

২.

যে সকল সুরায় মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে সেগুলো মাদানী।কেউ কেউ সুরা আনকাবুতকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলেছেন।

তবে বাস্তবতা হলো সুরা আনকাবুত সামষ্টিকভাবে মক্কী হলেও মুনাফিক সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো মাদানী।

৩.

যে সকল সুরায় يا أيها الذين آمنوا তথা হে ঈমানদারগণ! বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাদানী সুরা।

সুরাসমুহের বৈশিষ্ট্য:

১.

মক্কী সুরার আয়াতগুলো সাধারণত ছোট ও সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মাদানী সুরার আয়াতগুলো তুলনামূলক বড় ও লম্বা হয়ে থাকে।

২.

মক্কী সুরায় পৌত্তলিকতাকে খন্ডন করা হয়েছে।আর মাদানী সুরায় আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের খন্ডন করা হয়েছে।

৩.

মক্কী সুরাগুলোর ভাষা হৃদয়গ্রাহী,সাহিত্যালঙ্কারে ভরপুর। পক্ষান্তরে মাদানী সুরার আয়াতগুলো সহজ-সরল।

৪.

মক্কী সুরাগুলোয় আহকাম ও বিধি-বিধানের আলোচনা কম; তাওহীদ,রিসালাত ও আখেরাতের বর্ণনা বেশি।

পক্ষান্তরে মাদানী সুরাগুলোয় আহকাম ও বিধান সংক্রান্ত আলোচনা বেশি।

মূলত স্থান-কাল-পাত্রের তারতম্যের দরুন আয়াতগুলোর বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্য এসেছে।

(উলুমুল কুরআন,৫৯-৬২, সংক্ষেপিত)

৩১) সাহাবাদের সম্পর্কে কী আকীদা রাখা চাই?

মুসলিম বলে পরিচয় দানকারী সকলেই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এই পৃথিবীতে নবীজীর সাহচর্যে ধন্য সাহাবায়ে কেরামের জামাতের চাইতে শ্রেষ্ঠ উম্মত আর হতে পারে না।

হযরত আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লোকেদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য বের হবে।

তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? তাঁরা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে।

অতঃপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছেন? তখন তারা বলবেন, হাঁ আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে।

অতঃপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে,

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি আল্লাহর রসূল(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের সাহচর্য প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সাহচর্য প্রাপ্ত হয়েছেন? বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে জয়ী করা হবে।(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬৪৯)

নি:সন্দেহে তাঁরা অনেক ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ জামাত।আজকে আমরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম তহাবী রহ.বলেন,"আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসি।"(আকীদাতু ত্বহাবী,২১৪)

কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে ভালোবাসেন এবং তাঁরাও আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসেন। পবিত্র কুরআন কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন,তিনি(আল্লাহ) তাঁদেরকে ভালোবাসেন তাঁরাও তাঁকে ভালোবাসেন। তাঁরা মুমিনদের প্রতি নম্র এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর।"(সুরা মায়িদা)

রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করল,

সে আমার প্রতি ভালবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসলো।(তিরমিজি, হাদিস নং ৩৮৬২)

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যাদেরকে ভালোবাসতেন তাঁদেরকে ভালোবাসা মুমিনের কর্তব্য। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত ছাড়া কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারে না।

ইমাম তহাবী রহ.বলেন,আমরা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কাউকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করি না।আবার তাঁদের কারো থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি না।"(আকীদাতু ত্বহাবী,২১৬)

হযরত আলী রা. বলেন,আমার ব্যাপারে দুই শ্রেণীর লোক ধ্বংস হবে।

১.ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী,যে আমার এমন প্রশংসা করে যা আমার মাঝে নেই।

২.এমন বিদ্বেষ পোষণকারী আমার প্রতি যার ঘৃণা তাকে আমার উপর অপবাদ আরোপের দিকে ঠেলে দেয়।"(আসসুন্নাহ,ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল,১২৬৬)

বাস্তবেও এমন ঘটেছে।শিয়া-রাফেজীরা তাঁর প্রতি মহব্বতের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছে।আবার অন্যান্য সাহাবীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

আর খারেজীরা তাঁর ও আহলে বায়তের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ ও সীমা লঙ্ঘন করে আহলুসসুন্নাহর কাতার থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

ইমাম তহাবী রহ.বলেন,আমরা ঐ সকল লোকদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করি যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে এবং তাঁদের সমালোচনা করে।

আমরা তাঁদের (সাহাবায়ে কেরাম)কেবল প্রশংসা সহকারেই আলোচনা করি। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা দীন,ঈমান,ও ইহসানের আলামত।

আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী,মুনাফেকী ও সীমা লঙ্ঘনের আলামত।"(আকীদাতু ত্বহাবী,২১৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না।

তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমান সোনা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না।"(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬৭৩)

আমাদের সমাজে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা হয়তো অজ্ঞতাবশত সাহাবায়ে কেরামের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের রাজনৈতিক মতবিরোধ সংক্রান্ত আলোচনায় এই পদস্খলন বেশি ঘটে থাকে।তাই এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক হওয়া চাই।

নিজের ঈমান-আকিদাকে হুমকির মুখে ফেলে-এমন সবধরনের আচার-আচরণ সচেতন ভাবে এড়িয়ে চলা উচিত।

প্রচ্ছদঃ

রাহাত হোসেন